Issue cover not available

Vol. 13 | No. 1 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রকাব্যে উপমা রূপক ও প্রতীক

Volume	13
Issue	1
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আহমদ কবির
Published online	June 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i1.4
Pages	116-177
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রকাব্যে উপমা রূপক ও প্রতীক

আহমদ কবির

ভূমিকা

বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য উপমা, রূপক ও প্রতীকের যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে রবীন্দ্র কবিমানসের কয়েকটি মূল সূত্র অনুধাবন করা। প্রথম অধ্যায়ে কাব্যবিচারে অলঙ্কার শাস্ত্রের কার্যকারিতা সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে এবং সেই প্রেক্ষিতে উপমার রূপ-রীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র উপমার ক্রমবিকাশ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে উপমার বিভিন্ন দিক ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যথাসম্ভব দীর্ঘ বিশ্লেষণের অবতারনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের উপমা সম্বন্ধে বিদগ্ধ পণ্ডিতেরা অনেক কথা বলেছেন, অনেক বৈশিষ্ট্য তাঁরা দেখিয়েছেন ; কিন্তু কোন একটি আলোচনা আমরা পাইনা যাতে রবীন্দ্র উপমার ক্রমবিকাশ দেখানো হয়েছে, কিংবা তাঁর উপমা বৈশিষ্ট্যের সব দিকগুলো সূত্রাকারে গ্রথিত হয়েছে। বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধে রবীন্দ্র-উপমা বিশ্লেষণে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে। এই কারণে লক্ষ্য করা যাবে উপমা-রূপক-প্রতীক এই ত্রয়ী আলোচনায় উপমাই বেশীর ভাগ জায়গা জুড়ে বসে আছে। রবীন্দ্র কাব্যের রূপক ও প্রতীক সম্বন্ধে আলোচনা সবিশেষ হয়েছে, যাঁরা করেছেন তাঁরা সব বিদগ্ধ ব্যক্তি—এঁদের মধ্যে প্রথম বিশী, বুদ্ধদেব বসু ও সরোজ বন্দোপাধ্যায়ের নাম করা যেতে পারে। রূপক ও প্রতীক সম্বন্ধে তাঁদের আলোচনা রবীন্দ্র কবিমানসের স্বরূপের প্রতি সংকেতকৃত এবং সেদিক থেকে তাঁরা সার্থক। এই গবেষণা-প্রবন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র কাব্যের রূপক ও প্রতীকের রূপরেখা শুধু আঁকা হয়েছে, বিস্তারিত বিবরণ সেখানে—অবশ্য পূর্বতন অধ্যায়ে উপমা-বিশ্লেষণের সাথে রূপক-প্রতীকের বিশ্লেষণও হয়েছে—সে জন্যে রূপক ও প্রতীকের পৃথক আলোচনা সংক্ষেপে সারা হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ বলতে হয় কাব্যদেহে উপমা, রূপক বা প্রতীকের বিভাজন-প্রক্রিয়া সবসময় সম্ভব হয় না। উপমা-রূপক-প্রতীক—এগুলো অঙ্গাঅঙ্গী জড়িত—সে জন্যে যা উপমা বলে পরিচিত, তা-ই আবার প্রতীকী ভাবসংকেত সম্পন্ন, যা প্রতীক তা-ই হয়তো রূপক। এ কারণ অনুসন্ধানে জানা যাবে কবিতার অন্তর্নিহিত রহস্য কোন একটি সীমাবদ্ধ রূপবন্ধে ধরা দেয় না। দেয় না বলেই উপমা, রূপক বা প্রতীকের সঠিক সূত্র নির্ণয় অনেক সময় অসম্ভব। বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধের বিভিন্ন অধ্যায়ে যে আলোচনা হয়েছে তাতে রবীন্দ্র নাথের উপমা, রূপক ও প্রতীকের মূল সূত্রগুলো সম্মিলিতভাবেই অনুধাবনযোগ্য—অবশ্য মূলের গভীরে প্রবেশ করবার আগে কবিতায় অলঙ্কার প্রয়োগের কার্যকারিতার আলোচনা চলতে পারে প্রথমে।

প্রথম অধ্যায়

অলঙ্কার প্রয়োগের মূল সূত্র

কাব্যালোচনার সূত্রপাতে কবিতার স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। কবিতা কি এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। কবিতার বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা হচ্ছে এই কবিতা কয়েকটি ছন্দোবদ্ধ বাচ্যের সমষ্টি, শব্দের অর্থনির্ভর সুশৃঙ্খল বিন্যাসের মধ্যে যা স্বরূপায়িত হয়। কবিতা পড়বার সময় যে একটা ঝঙ্কার শ্রুতিগ্রাহ্য তা আসলে শব্দের বিন্যাস পদ্ধতির ফল। কিন্তু তা যে পুরোপুরি অর্থের সঙ্গে সম্পর্কতযুক্ত এ কথা ভোলবার নয়। অর্থকে বাদ দিয়ে শব্দ ব্যবহারের কোন সার্থকতা নেই যতই তা ছন্দের খাতিরে প্রযোজ্য হয় না কেন। কাব্য সম্বন্ধে সস্কৃত আলঙ্কারিকদের মত ছিল এই তাকে অলঙ্কৃত হতে হবে। শব্দ ও অর্থ ছাড়া যে কাব্যের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই একথা তাঁরা ভালভাবে জানতেন। জানতেন বলেই তাঁরা শব্দ ও অর্থ উভয়েরই সৌন্দর্য বিধানের অলঙ্করণের পরামর্শ দিয়েছেন। এতে কবিতা আটপৌরে অবস্থা কাটিয়ে সাজসজ্জায় সজ্জিত হতে পারে, এবং সেই সঙ্গে চারুত্বও লাভ করতে পারে। 'কাব্যম গ্রাহ্যমলংকারৎ'—অর্থাৎ অলঙ্কৃত কাব্যই কাব্য—আলঙ্কারিক বামণের এ উক্তি এ ক্ষেত্রে স্মরণীয়।

কিন্তু অলঙ্কার বলতে আমরা বুঝি বাইর থেকে আরোপিত কিছু—কিছু প্রাণহীন জড়বস্তু যার নিজস্ব সৌন্দর্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু কোথাও প্রযুক্ত হয়ে তার

সৌন্দর্য বৃদ্ধি করাতেই অলঙ্কারের সার্থকতা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কাব্যদেহে কি বাইর থেকে কিছু আরোপ করা সম্ভব? সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা কাব্যদেহকে রমণীদেহের সাথে তুলনা করে বলেছেন রমণীদেহকে সুশোভিত করার জন্য যে ভাবে ভূষণাদির প্রয়োগ চলে তেমনি কাব্য দেহকে সুষমাময় করার জন্য উপমা, উৎপ্রেক্ষা, শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস ইত্যাদি অলঙ্কারের প্রয়োগ চলতে পারে। অলঙ্কৃত রমণীদেহ যে সুন্দর এ কথা আমরা মানবো, কিন্তু এও আমাদের অভিজ্ঞতা আছে যে অতি-অলঙ্করণ কতখানি সেই রমনীর হাসপাস অবস্থা ঘটায়। কাব্যেও এই অতি-অলঙ্করণ দোষের—কাব্যামোদী পাঠকের কাছে তা বেসামাল ভারবস্তু হিসেবে পরিগণিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে। এতে বোঝা যায় কাব্যে অলঙ্কণের পরিমিতিই কাম্য।

অলঙ্করণের সত্যই কোন যাথার্থ্য আছে কিনা দেখা দরকার। এমনও দেখা গেছে শব্দ ও অর্থ উভয় রকম অলঙ্কার আছে অথচ বাক্য কাব্য হলো না। এর উল্টোটার উদাহরণও প্রচুর। এমন অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা আছে যাতে অলঙ্কার বলতে কিছু নেই। যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটি চরণ,

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।

এ কবিতায় অলঙ্কার বলতে যা বুঝায় তার কিছু নেই। অথচ কবিতাটি সার্থক। কবি আমাদের বিশ্বাসযোগ্যভাবে বুঝিয়ে দেন যে তাঁর রুদ্ধ হৃদয়ের আকুলতা মুক্তি পেয়ে যেন সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরতে চায়। ওই 'কোলাকুলি' শব্দটির মধ্যে যে চিত্র ও অনুষঙ্গ জড়িয়ে আছে তা কবিকল্পনার শক্তিমত্তাকে প্রকাশ করে শুধু। সুতরাং আমরা দেখছি অলঙ্কার ছাড়াও কবিতা হতে পারে এবং তার আবেদনও হতে পারে চিরন্তন। তবে কবিতায় অলঙ্কার প্রয়োগের কথা আসে কেন? কবিতায় অলঙ্কার কি শুধুমাত্র সাজসজ্জার উপকরণ? শুধু শোভাবর্ধনকারী? প্রমথ চৌধুরী বলেন, 'অলঙ্কার হচ্ছে কাব্যের এক প্রকার ভাষা।'[১]

কবিতার ভাষা কি?—ভাষা হচ্ছে প্রধানতঃ অনুভূতির প্রকাশ মানতা। আমাদের ভাবনা চিন্তা ও কল্পনার প্রকাশ ভাষার দ্বারাই সম্ভব হয়। কবিতার কাজ অপরের হৃদয়ে রসানুভূতি জন্মানো। সেখানে কবির ভাষা কৌশলপূর্ণ হতে বাধ্য, বাচ্যার্থকে

ছাড়িয়ে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনা নির্ভর সে ভাষা। কবিতা যদি শুধু মাত্র আমাদের আটপৌরে জীবনের খবরটুকু যথাযথ প্রকাশ করতো তা'হলে তা আর কবিতা থাকতো না। মানুষের হৃদয়ের রসানুভূতিগুলো সূক্ষ্ম, সুকুমার এবং অনন্তবৈচিত্র্যশীল এবং হৃদয়ের গহনে বহুস্থলেই তাহা চিৎ-স্পন্দ। এই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার চেষ্টাই হইল আমাদের সকল সাহিত্যচেষ্টা—এমনকি সকল শিল্পচেষ্টা। সাধারণ বচনের দ্বারা প্রকাশ্য নয় বলিয়াই আমাদের রসোদ্দীপ্ত বা রসাপ্লুত চিৎ-স্পন্দন অনির্বচনীয়; সেই অনির্বচনীয়কে বচনীয় করিয়া তুলিবার জন্য তাই প্রয়োজন অসাধারণ ভাষার।"[২] এই অসাধারণ ভাষাই হলো কবিতার ভাষা।

ভাষা যে ভাবনা, চিন্তা ও কল্পনার প্রকাশক এ কথা আমরা বলেছি। এখানে কবি ভাবনা সম্বন্ধে একটু বিশ্লেষণ দরকার। কবিতা সৃষ্টির জন্য কবি কোন বিষয় বা বস্তুকে অবলম্বন করে থাকেন। এটা যে প্রাথমিক ভাবে তাঁর কাছে একটা স্থূল বস্তুরূপ ছাড়া আর কিছু নয়, তা যে-কোন সৎ কবি স্বীকার করবেন। কিন্তু কাব্য শরীরে এ বস্তুর স্বরূপ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। এ্যারিষ্টোটল সাহিত্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন সাহিত্য হচ্ছে জীবনের অনুকৃতি। এখানে জীবন চোখে দেখা বাস্তব-জীবন নয়, তার অনুরূপ। সে হিসাবে বলা চলে কবিতার বস্তু বস্তু নয়, বস্তুর মতো। ওটাই কবিতার বিষয় বা ভাব। এই ভাববস্তু কবি লৌকিক জগৎ থেকে সংগ্রহ করেন—কাব্যে ব্যবহৃত হয়ে তা লোকোত্তর ব্যঞ্জনা দেয়। কাব্যের স্বভাবই তা। কবিচিত্তের অনুভূতিতে জারিত হয়ে লৌকিক ভাববস্তু যখন নতুন প্রকাশ রূপ লাভ করে কাব্যামোদী পাঠক তখনই এর রস আহরণে সমর্থ হয়। কবিচিত্তে অনুভূতির সঞ্চার এবং এর প্রকাশ দুই-ই কবির হৃদয়াবেগ সম্ভূত। হৃদয়াবেগের প্রশান্তিই সার্থক কবিতার জন্ম দেয়। তাই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেন চিরন্তনে বিধৃত আবেগ প্রশান্তিই কবিতা সৃষ্টির মূলে কাজ করে।[৩] রবীন্দ্রনাথের মতেও এই প্রশান্তির স্নিগ্ধতার মধ্যেই হৃদয়াবেগ কাব্যরসে পরিণত হয়। টি. এস. এলিয়ট প্রভৃতি আধুনিক কবি-সমালোচকরা ওয়ার্ডস্‌র্থের এই সংজ্ঞা না মেনে বলেছেন কবিতা হচ্ছে কবিচিত্তের অনেকগুলো অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণজাত বাণীরূপ। এলিয়টের এই সংজ্ঞা মনে রেখেও আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতের সাথে এলিয়টের মতের মূলগত বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সবগুলো অভিজ্ঞতাই তো কবিচিত্তে একটা সংমিশ্রিত রূপ নেয় এবং হৃদয়াবেগের বিশেষ অবস্থায় তা কাব্যরূপ পায়। কবি যা সৃষ্টি করেন তা তাঁর নিজস্ব। শিল্পকর্ম ব্যক্তিমানসের

সৃষ্টি বলে একই বিষয় বিভিন্ন কবির হাতে নতুন রূপ পরিগ্রহ করে। ইউলিসিস সম্বন্ধে লিখেছিলেন অমর কবি হোমার, সে একই বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন টেনিসন। অথচ দুটোই আলাদা। কালিদাসের 'মেঘদূত' আর রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' ভাবগত দিকদিয়ে এক হয়েও ভিন্ন ভিন্ন কবিকৃতি বলে স্বীকৃত।

ভাবগত দিক থেকে এক হওয়া সত্ত্বেও কবিতার বিভিন্নতার মূলে আমরা আরো একটি কারণ নির্দেশ করতে পারি—সেটি হলো কবিকল্পনা। একজন কবির কল্পনা অন্যজনের কল্পনার ধারার সঙ্গে কাঁটায় কাঁটায় মিলে যাবে এমন চিন্তা বাতুলতা। জীবনানন্দ দাশ বলেন, "কবিতা লিখতে হলে ইমাজিনেশনের দরকার, এর অনুশীলনের। এই ইমাজিনেশন শব্দটির বাংলা কি? কেউ হয়তো বলবেন কল্পনা কিংবা প্রতিভা বা ভাব প্রতিভা। বুদ্ধি সকলেরই আছে এ কথা বলা চলে না। কল্পনা সব মানুষের মনে সমান বিস্তার বা নিবিড়তা পেয়েছে বা পেতে পারে—এ কথা মনে করা ঠিক নয়। উৎকর্ষের তারতম্য আছে।"[৪] সুতরাং দেখা যাচ্ছে কবিতার পার্থক্য, উৎকর্ষগত অপকর্ষগত যা-ই হোক না কেন, কল্পনার দ্বারাই সূচিত হয়। এ জন্যে কল্পনাকে কবি প্রতিভা বলতে আপত্তি নেই। কল্পনা মনগড়া কোন ব্যাপার নয়, সত্য বা বাস্তবের বিপরীতার্থকও নয়। এটা এক প্রকার ভাবদৃষ্টি যার সাহায্যে বিষয় বা বস্তুকে লৌকিক স্তর থেকে তুলে এনে সাহিত্য-রসাশ্রিত করে তোলা হয়। সেখানে জীবন জীবনের মতো বস্তু বস্তুর মতো প্রতীয়মান হবে। শিল্পগুরু এ্যারিষ্টোটল সাহিত্যশিল্পের ব্যাখ্যা এই ভাবেই করেছেন।

কল্পনার প্রধান কাজ বিভিন্ন কাব্যিক উপাদানগুলোকে জড়ো করা, একটি সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলায় এদের বিন্যাস করা যার ফলে দৃশ্য-অদৃশ্য, ব্যক্ত-অব্যক্ত, বচনীয়-অনির্বচনীয় ভাববস্তুগুলো একই সূত্রে গাঁথা হয়ে যায়। বিশিষ্ট কবি প্রতিভার বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে এই শৃঙ্খলায়িত বিন্যাস-পদ্ধতির শক্তির মধ্যে। কবি যখন বলেন,

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।[৫]

তখন আমরা কবি কল্পনার অনন্যতার কথা ভাবি, ভাবি সকল ব্যথা রঙিন হওয়ার আবেগ-মধুর রূপাটিকে। আমরা এ কথা ভাবি না যে ব্যথার সাথে গোলাপের কি সম্পর্ক? তবুও একটা অপরূপ সাযুজ্য দৃষ্টি এড়ায় না আমাদের অনুভূতি ঘন

হয়, কবির রক্তিম হৃদয়বেদনার অবস্থাটিকে ওই দুটি চরণেই সার্থকভাবে আমরা পাই। আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা।[৬]

প্রভাত সূর্যের আলোয় দহন বা দীপ্তি নেই এ কথা সত্যই, কিন্তু তাকে কচি লেবু পাতার মতো নরম ও সবুজ বলে ভাববার মধ্যেই কবি কল্পনার স্বাতন্ত্র্য নিহিত। ও দুটি বিশেষণই প্রভাত আলোর মধ্যে কমনীয়তা ও সজীবতা এনেছে এবং আমাদের ইন্দ্রিয়কে নিবিড়ভাবে নাড়া দিয়েছে। কচি লেবুপাতার মধ্যেই নবোদিত সূর্যের কিরণের স্বাদু অস্বাদ আমরা পাচ্ছি। অথচ দুটোর সম্পর্ক আমাদের সাধারণ ভাবনায় কখনো ধরা দেবার নয়। কিন্তু কবি তা ধরতে পেরেছেন। তাই বলা চলে কল্পনা হচ্ছে কবির সৃজনক্ষমতা, তাঁর উদ্ভাবনী শক্তি, তাঁর আবিষ্কার।

কল্পনার মাধ্যমেই কবির হৃদয়ানুভূতির প্রকাশ ঘটে, আর এই প্রকাশের জন্য চাই ভাষা—কবির বিশেষ ভাষা। এই ভাষা সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে পৃথক হতে বাধ্য। কবির অন্তর্লোকের ভাবনা গূঢ় পরিচয়কে ধরে রাখবে তাঁর বিশেষ ভাষা। এই ভাষাকে তাই প্রশস্ত অর্থে বলা চলে অলঙ্কৃত বা সালঙ্কার ভাষা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের গতানুগতিক সংজ্ঞাকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না, কবির হৃদয়ানুভূতির প্রকাশক্ষম ভাষাকেই সালঙ্কার ভাষা বলে ধরে নিতে আমাদের আপত্তি নেই। এই ভাষা যে শুধুমাত্র উপমা-উৎপেক্ষা বা অনুপ্রাস মণ্ডিত হবে এমন কোন বিধিবদ্ধ মত গ্রহণযোগ্য বিবেচিত নয়। আর অলঙ্কার যদি বাইরের ব্যাপার বলে ধরে নেওয়াও হয় তবুও তা শৃঙ্খলায়িত কবিকল্পনায় নিয়মসম্মতভাবে ব্যবহৃত হয়। কল্পনাকে যুক্তি বিচারের দ্বারা সংযত রাখাই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার লক্ষণ। মোহিত লাল বলেন, "এই বিচারবুদ্ধিই হইল কবিতার প্রাণ, 'কল্পনা' অলঙ্কারাদি দ্বারা কাব্যের প্রসাধন করিবে মাত্র।"[৭]

কবিতার কাজ শুধু তথ্য বর্ণনা বা খবর দেওয়া নয়, কবিতা আমাদের চিত্তবৃত্তিকে জাগিয়ে দেয় যার ফলে আমাদের সীমাবদ্ধ ভাবনার অবসান ঘটে, সৃষ্টি হয় নতুন সুর নতুন ব্যঞ্জনা। এ জন্য কবিতার ভাষাকে হতে হয় ব্যঞ্জনাধর্মী। এ ক্ষেত্রে

এ কথাও মনে রাখা দরকার কবি যে ভাষা সৃষ্টি করেন তাতে তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সহজেই অনুভূত হয়। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের কারও কারও এ বিশ্বাস ছিল কবিতায় অলঙ্কার প্রয়োগের মধ্যেই কাব্যআত্মার সন্ধান করা যেতে পারে। কিন্তু একদল আলঙ্কারিক এ মতের প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন। তাঁরা বললেন নিরলঙ্কার বাক্যও যে কাব্য হতে পারে তার কারণ কাব্যের আত্মা হচ্ছে রীতি বা ষ্টাইল, অলঙ্কার এর আনুষঙ্গিক বস্তু হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ষ্টাইলের মধ্যেই কবি-ব্যক্তিত্বের প্রভাব নিহিত, আর সে কারণেই কাব্যে অলঙ্কার প্রয়োগে ভাষা হয়ে ওঠে স্বতন্ত্রধর্মী। রীতি বা ষ্টাইলের দোষ দেখিয়ে একদল আলঙ্কারিক মত দিলেন কবিতার আত্মা হচ্ছে এর বক্তব্য বা বাচ্য। বক্তব্য কাব্যোপযোগী হলেই কাব্যের অভিনবত্ব বা চমৎকারিত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বক্তব্য বা বাচ্য হচ্ছে ভাব ও বস্তুর সমাবেশ। ভাব ও বস্তু এবং এর সাথে যথোচিত অলঙ্কার সমাবেশে রীতির সংযোগ ঘটলেই মনোজ্ঞ কাব্য সৃষ্টি হয়। কাব্যের আত্মা এ সবগুলোর সমাবেশেই সৃষ্ট। কিন্তু কবিতা যে শুধুমাত্র খবরটুকু দেয় না এবং তার কাজ যে আরো ভিন্নমুখী ও গভীর সে কথা স্মরণ রাখা দরকার। শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রকৃতি হলো বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া, বিষয়ের সীমার বন্ধনমুক্ত করা, নতুন ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করা। বাচ্যাতিরিক্ত এই ব্যঞ্জনাকে ধ্বনিবাদী আলঙ্কারিকরা নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি' বা 'ব্যাঙ্গার্থ'। ধ্বনিবাদীরা আরো বলেছেন এ ধ্বনি ভাবের নয়, বস্তুর নয়, অলঙ্কারেরও নয়। তবে এ কিসের এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। ধ্বনিবাদীতের মতে এ ধ্বনি রসের ধ্বনি।[৮] তাঁদের মতে রসই কাব্যের আত্মা।

কাব্যের আত্মা-সন্ধানে আলঙ্কারিকরা অলঙ্কারবাদ থেকে রসবাদে এসে পৌঁছেছেন। তাদের এই দীর্ঘপথ পরিক্রমণ ব্যর্থ হয়নি এই কারণে যে কাব্যের ভালোমন্দ, এর সার্থকতা বা ব্যর্থতা সম্পূর্ণভাবে কাব্যামোদী পাঠক চিত্তের উপর নির্ভরশীল। কবি যে ভাবকে অবলম্বন করবেন তাকে যদি সাধারণভাবে প্রকাশ করা হয় তবে তার কাব্যত্ব থাকে না, তিনি যদি আপন প্রতিভাবলে ঐ ভাবকে এমন ভাবে প্রকাশ করেন যার ফলে পাঠকচিত্ত তন্ময়ত্ত প্রাপ্ত হয় তখনই তা হয় রস। যে ভাবকে তিনি রসমূর্তি দিতে চান, যদি পাঠকের মন সে ভাব সম্পর্কে কতকটাও কবির মনের সমধর্মী না হয়, তবে তা পাঠকের কাছে ব্যর্থ। কাব্যের এই রসসৃষ্টিই প্রধান কথা। এ রস ব্যাখ্যার অতীত বাচ্যাতিরিক্ত এক ব্যঞ্জনা-স্নিগ্ধ অনুভূতি যা কবি প্রতিভার সুনিপুন আঁচড়ে সুপরিস্ফুট হয় কাব্যে। এ দিক থেকে আমরা দেখতে

পাই কাব্যে অলঙ্কার প্রয়োগের উদ্দেশ্য বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি ও রসের পরিপুষ্টি সাধন। অলঙ্কার প্রয়োগে কাব্যের রসই অলঙ্কৃত হয়।

অলঙ্কৃত কাব্যের ভাষাকে ভামহ বলেছেন বক্রোক্তি। বক্রোক্তি এখানে বাঁকা কথা নয়, কাব্যোচিত বিশেষোক্তি। অলঙ্কার এই বিশেষোক্তির পর্যায় মাত্র। প্রসঙ্গে ভামহ আরো একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন কাব্যোক্তি সর্বক্ষেত্রেই অতিশয়োক্তি। কথাটির গভীর ব্যঞ্জনা রয়েছে। মোটামুটি অর্থে দেখতে গেলে শিল্প-কৃতি মানে 'বাড়িয়ে বলা'।[৯] কবি যে বিন্দুর মধ্যে বিসন্ধু আবিষ্কার করেন, চোখের জলে সাগর দেখতে পান কিংবা নিজেকে উদার বিশাল আকাশের মতো ভাবেন তার মূলে আছে এই বাড়িয়ে বলার প্রবৃত্তি। শিল্পের ভাববস্তু কখনো সীমাবদ্ধ অর্থে সংযুক্ত নয়। ভাষাও সেদিক থেকে অর্থের গভীরতায় লীন হয়ে যায়। এ জন্যে ক্রিষ্টোফার কডওয়েল বলেছেন কবিতার ভাষা হচ্ছে 'উচ্চকিত ভাষা' (Heightened Language)।

অভিনবগুপ্ত প্রভৃতি রসধ্বনিবাদীরা কাব্য সৃষ্টি ব্যাপারে অলঙ্কারকে গৌণ করেননি, বরং কাব্যক্ষেত্রে এর ভূমিকাকে সর্বাগ্রে স্বীকার করেছেন। কবিহৃদয়ে যে রসানুভূতির জন্ম, তার উপযুক্ত প্রকাশের জন্য চাই সালঙ্কার-ভাষা। ভাষাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা কবির কোন পৃথক প্রয়াস নয়। রসানুভূতির জন্ম ও তার প্রকাশের মধ্যে রয়েছে সম্পৃক্তি ও পরস্পর নির্ভরশীলতা। সুতরাং সেখানে পৃথক প্রয়াসে ভাষাকে গড়ে তুলতে হয় না, ভাবই ভাষাকে গড়ে তোলে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি প্রবন্ধে বলেছেন,

> সেই ভাব, সেই ভাবনা, সেই আবির্ভাব, যাকে প্রকাশ করতে গেলেই অলংকার আপনি আসে, তর্কে যার প্রকাশ নেই, সেই হল সাহিত্যের।[১০]

এখানে এই সত্য স্পষ্ট হয় যে প্রকাশের স্বাভাবিকত্ব ভাষাকে অলঙ্কৃত করে।

আজকের দিনে কারো কারো কাছে অলঙ্কার যে দোষের বলে বিবেচিত হচ্ছে তার কারণ কাব্য সৃষ্টির প্রয়োজনে এর রীতিসিদ্ধতা একটি নিয়ম বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতার জন্যে। একটি উদাহরণ দেওয়া চলে। সংস্কৃত কবি তাঁর কাব্যের নায়িকার বর্ণনা দিচ্ছেন,

> তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিত হরিনী প্রেক্ষণা নিম্ন নাভি।
> শ্রোণী ভারাদলস গমনা স্তোক নম্রা স্তনাভ্যাং।[১১]

[তন্বী, শ্যামা, আর সূক্ষ্মদন্তিনী, নিম্ননাভি ক্ষীনমধ্যা,
জঘন গুরু বলে মন্দ লয়ে চলে চকিত হরিনীর দৃষ্টি
অধরে রক্তিমা পক্কবিম্বের ; যুগল স্তনভারে ইষৎ নতা।][১২]

নায়িকার নিখুঁত সৌন্দর্য পরিকল্পনায় সংস্কৃত কবির উপরোক্ত আলঙ্কারিক বর্ণনার প্রাচুর্য প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু দেখা গেছে এ বর্ণনা বিধিবদ্ধ রূপ নিয়েছে। শুধু সংস্কৃত কাব্যে কেন মধ্যযুগের বাংলা কাব্যগুলোতে সর্বত্রই নায়িকা-বর্ণনা একই। কোথাও গতানুগতিক রীতির বাইরে যাওয়ার প্রবণতা কবিদের ছিল না। চণ্ডীদাস হতে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত এই সুদীর্ঘকালে একই রীতির অনুবৃত্তির পৌণ-পুনিকতা আমরা দেখেছি, বেশীর মধ্যে যা হয়েছে তা হলো নায়িকার পায়ের নখ থেকে আরম্ভ করে মাথার চুল পর্যন্ত সবকিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলঙ্কারিক বর্ণনার প্রবর্তনা। স্বভাবতই ওচিত্যবোধের প্রশ্ন আসে। আজকের দিনের কোন কবি এই নিয়মসিদ্ধ পথে চলেন না, কেন না কবিতাকে হতে হয়েছে আবিষ্কারধর্মী, নির্দিষ্ট প্রথার পথে তার চলমানতা নেই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা শব্দালঙ্কারের ও অর্থালঙ্কারের অতিরিক্ত প্রাধান্য দিতেন কবিতার শোভাবর্ধনের জন্য এবং কবিতার জন্য অলঙ্কারকে যে তাঁরা অনিবার্য মনে করতেন এও আমরা বলেছি। প্রাসঙ্গিক আলোচনায় আমরা দেখিয়েছি আলঙ্কারিক পথে না গিয়েও কবিতা কত ভালো হতে পারে। কিন্তু পুনরাবৃত্তি হলেও এ কথা আমরা বলি যে অলঙ্কারের যথাযথ ও সংযত প্রয়োগ কাব্যের প্রসাধন ও শোভাবর্ধন করে।

ভাষায় অলঙ্কার প্রাথমিকভাবে শব্দের উপর নির্ভরশীল। কোন বাক্যের মধ্যে পদগুলির সমষ্টিতে আমরা পাই ধ্বনি (Sound), আর পাই পদগুলির অর্থ (Sense)। কবি কল্পনায় কবিতার শব্দ যেমন অলঙ্কৃত হয় তেমনি অর্থও অলঙ্কৃত হয়। এ বিচারে আমরা অলঙ্কারকে দুভাগে ভাগ করে নিতে পারি।—এক, শব্দালঙ্কার ; দুই, অর্থালঙ্কার। অনুপ্রাস, শ্লেষ, যমক ইত্যাদি অনেকগুলো বিভাগ আছে শব্দালঙ্কারের। এ আলোচনায় সে সবের বিবরণ অপ্রয়োজনীয়, তবুও বলতে হয় কাব্যের ভাষাকে 'বিশেষ' করে গড়ে তুলতে শব্দালঙ্কারের যে বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে তা সম্ভব হয় এর ধ্বনিগুণ বা সংগীত ধর্মের জন্য। যদি শুধুমাত্র কবির বাকভঙ্গি প্রকাশের কারণে শব্দালঙ্কার ব্যবহৃত হয় তা'হলে তার প্রয়োগই বটে। কেন না শব্দালঙ্কারের উপযুক্ত কাজ হলো কাব্যছন্দকে ভিত্তি করে শব্দের অর্থকে বিচিত্র ধ্বনি তরঙ্গের মধ্যে বিস্তার করে দেওয়া। শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাসের 'মেঘদূত' জাতীয় কাব্য ধ্বনিগুণে চিরদিন

ভাস্বর। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্ত প্রভৃতি বাঙ্গালী কবিরা শব্দালঙ্কার নিয়ে বিচিত্র 'কারদানি' কম করেননি, অবশ্য তাঁরা যে ধ্বনি সম্পদের অন্তর্গূঢ় তাৎপর্য সবসময় ধরতে পারেননি এ কথা মনে রাখা যেতে পারে। তবুও এঁদের কারো কারো শব্দালঙ্কার প্রয়োগ অপূর্ব হয়েছে, যেমন ঈশ্বরগুপ্তের অনুপ্রাসমণ্ডিত সেই বিখ্যাত চরণ, 'বিবিজান চলে যান লবেজান করে'। কিন্তু শব্দালঙ্কার যখন ওজস্বী ছন্দে ধ্বনির মন্দ্রমধুর তরঙ্গ বিস্তারের সাহায্য করে তখন তা যে কতখানি শক্তিশালী হয়ে ওঠে আমরা দেখবো মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র একটি অংশ থেকে,

ত্যাজি ধনুঃ, নিষ্কোষিলা অসি মহাতেজাঃ
রামানুজ ; ঝলসিলা ফলক আলোকে
নয়ন! হায়রে, অন্ধ অরিন্দম বলী
ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভুতলে
শোনিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা ;
গর্জিলা উথলি সিন্ধু, ভৈরব-আরাবে
সহসা পুরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে
মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে
সভায় কর্ব্বুর পতি, সহসা পড়িল
কনক মুকুট খসি, রথ চুড়া যথা
রিপুরথ কাটি যবে পাড়ে রথতলে।
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে![১৩]

ধ্বনির গম্ভীরতায়, অনুপ্রাসের ঘনঘটায়, শব্দমালার দৃঢ় গ্রন্থনে মেঘনাদের মৃত্যু-দৃশ্য যেন একটি অতি বিক্ষুব্ধ ও মথিত অথচ মহান সমাপ্তির রেশ রেখে যায়। কিন্তু মধুসূদনের উপর এও অভিযোগ আছে শব্দ প্রয়োগ তাঁর কাব্যে অনেকটা অভিধান নির্ভর, অলঙ্কার সেদিক থেকে সাজসজ্জা বা প্রকরণগত দিক, সেখানে মধুসূদনের কৃত্রিমতা অনেক সময় প্রকট। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কৃত্রিমতার পরিপোষক নন কখনো, অলঙ্কারকে কখনো তিনি আরোপ্যমান ব্যাপার বলে মনে করেননি। তাঁর কাব্যে ভাবানুযায়ী ভাষাই পরিলক্ষিত অর্থাৎ রবীন্দ্র কবি প্রতিভায় অলঙ্কার স্বাভাবিক কবিবৃত্তির প্রকাশ। তাঁর শব্দালঙ্কারে এই স্বাভাবিকতাই আমরা প্রত্যক্ষ করি। নিম্নোক্ত দুটি উদাহরণ এর প্রমাণ দেবে।

১. স্নিগ্ধ সজল মেঘ কজ্জল দিবসে
বিবশ প্রহর অচল অলস আবেশে।
শশীতারাহীনা অন্ধতামসী যামিনী,
কোথা তোরা পুরকামিনী।[১৪]

২. দূরে একদিন দেখেছিনু তব কনকাঞ্চল-আবরণ,
নবচম্পক আভরণ।
কাছে এলে যবে হেরি অভিনব
ঘোর ঘননীল গুণ্ঠন তব,
চল চপলার চকিত চমকে করিছে চরণ বিচরণ—
কোথা চম্পক-আভরণ।[১৫]

শব্দালঙ্কারে যেমন আমরা পাই ধ্বনির সৌন্দর্য সম্পদ, অর্থালঙ্কারে তেমনি পাই অর্থগত সৌন্দর্য। শব্দকে সাজিয়ে গুছিয়ে প্রকাশ করা যায় অনুপ্রাস, যমক, শ্লেষ ইত্যাদি দ্বারা, অর্থেরও তেমনি সৌষম্য বিধান করা হয় উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা ইত্যাদি দ্বারা। আলঙ্কারিক গঠনের দিকে নজর না রেখে অর্থশোভা লক্ষ্য করে শব্দকে আমরা বাক্যে ব্যবহার করতে পারি। শব্দ ব্যবহারের চমৎকারিত্ব সেখানেই যেখানে তা অর্থময় হয়ে কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করে। অর্থালঙ্কারের যে বৈশিষ্ট তাতে অর্থের খাতিরে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে বদলিয়ে প্রতি শব্দ বসানো চলে, তাতে বাক্যের অর্থের বড় একটা হেরফের হয় না। শব্দালঙ্কার সম্পূর্ণরূপে ধ্বনির উপর নির্ভরশীল বলে সেখানে শব্দ বদলানোর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কথা হলো অর্থালঙ্কারের প্রতি শব্দকে হজম করবার শক্তি থাকলেও তাতে কাব্যত্ব থাকবে কিনা ওটা হচ্ছে প্রশ্ন। কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে যে কথা বারবার বলা হয় তাহলো কবিতা হচ্ছে কবির হৃদয়নুভূতির ছন্দোবদ্ধ প্রকাশ। সেখানে শব্দের ধ্বনির যেমন প্রাধান্য আছে, তেমনি এর অর্থেরও, দুইই ওতপ্রেতভাবে জড়িত। এ জন্যই বলা হয় শব্দালঙ্কার বা অর্থালঙ্কার কিছুই কাব্যের ভূষণ নয়, কাব্যিক প্রকাশের সম্মিলিত উপাদান এগুলো। অর্থালঙ্কার সম্বন্ধে আরেকটি কথা হচ্ছে এই যে এর মধ্যে রয়েছে চিত্রধর্মের প্রাধান্য। কবিতার ভাববস্তু বাইরের জগত থেকে সংগৃহীত, কবির মনোরাজ্যে সেই বহির্জাগতিক ভাববস্তুগুলো সংস্থাপিত হয় এবং এতে করে সৃষ্টি হয় কবি ভাবনার। কবিতায় সেই ভাবনা-প্রকাশের মধ্যে বহির্জাগতিক বস্তুগুলোর প্রতিচ্ছবি আমরা দেখতে পাই। কবি "ভাষার মধ্যে নিহিত এই যে বহির্জগতের প্রতিচ্ছবি তাহাই ভাষার চিত্রধর্ম।"[১৬]

কবি যা ব্যক্ত করেন তার জন্য কোন না কোন ভাবেই চিত্র অবলম্বিত হবে। শব্দগঠন প্রক্রিয়ায় চিত্রধর্মকে পুরোপুরি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল এ কথা যে কোন ভাষাতাত্ত্বিক স্বীকার করবেন, কিংবা এও বলা যেতে পারে দীর্ঘদিনের অভ্যাসের দরুণ শব্দের অর্থ আমাদের মনে এমনভাবে গেড়ে বসে আছে যে তার চিত্র সম্বলিত ধারণাকে খুঁজে পেতে আমাদের বেগ পেতে হয় না। 'হাতী' বললে লম্বা শুঁড়ওয়ালা বিরাট কর্ণবিশিষ্ট স্ফীতকায় এক বিশেষ জন্তুকে বোঝাবে তাতে সন্দেহ নেই এবং আমরা যখন কোন ভুঁড়ি সর্বস্ব মোটা লোককে 'হাতী' বলে ঠাট্টা করি তখন আমাদের মনে যে চিত্রের অনুষঙ্গ জেগে ওঠে তা ওই 'হাতী' থেকেই পাওয়া। শুধু শব্দে কেন বাক্যের অর্থ শৃঙ্খলার জন্য চিত্রের উপর নির্ভর করতে হয়। কবি যখন বলেন,

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে

এখন শব্দ সংস্থানের ধারাবাহিকতায় বর্ষাকালীন মেঘাচ্ছাদিত আকাশের একটা চিত্রকেই আমরা পাই। এ জন্য বলা চলে চিত্রব্যতীত যেমন ভাষা সৃষ্টি হয় না, তেমনি মনের ভাবের প্রকাশও চলে না।

অর্থালঙ্কারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার একটি। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ইত্যাদি সবগুলোই সাদৃশ্য মূলক অলঙ্কারের অঙ্গ। আমাদের আলোচনা অলঙ্কার শাস্ত্রের বিস্তৃত বিবরণ নয়, এ প্রবন্ধের বিষয়ানুসারী বলে সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যাক প্রথমে। "পৃথক পৃথক জাতি বা শ্রেণীভুক্ত দুটি পৃথক উপাদানের মধ্যে কোনো ঐক্য, সংগতি বা সাদৃশ্য লক্ষ্য করে যে সব অলঙ্কার প্রযুক্ত হয়, সেই সব অলঙ্কারের নাম সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কার।"[১৭] সংজ্ঞাতেই বোঝা যাচ্ছে একই শ্রেণীভুক্ত উপাদানের মধ্যে সাদৃশ্য মূল্যহীন। কবি কল্পনার এমনই একটা শক্তি আছে যেখানে তা দুটো বিসদৃশ্য বস্তুর মধ্যে মিল দেখতে পায়, সে মিল আকারগত প্রকারগত না হলেও গুণগত বটে। মুখকে চাঁদের মতো কল্পনা করে দুটো বিসদৃশ বস্তুর গুণগত মিল দেখানো গেল ঠিকই, কিন্তু আধুনিক কবি যখন পূর্ণিমার চাঁদকে 'ঝলসানো রুটি'[১৮] বলে ভাবেন তখন আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না যে এটা কোন জাতীয় সাদৃশ্য কল্পনা, অথচ হৃদয়াবেগের যে বিক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে কবি এ কল্পনা করেছেন তা ভাবলে এর অনিবার্যতা ও স্বাভাবিকতা স্বীকার করে নিতে হয়।

উপমা

উপমা স্যাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের মূল অলঙ্কার। সাদৃশ্যমূলক অলঙ্কারের অনেকগুলো বিভাগ আছে বটে এবং তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে বটে, যেমন উপমা ,রূপক, উৎপ্রেক্ষা, ভ্রান্তিমান, সন্দেহ, ব্যাতিরেক, সমাসোক্তি, দৃষ্টান্ত প্রায় ডজন ছয়েক নাম তথাপি উপমেয় উপমানকে প্রাধান্য দিয়ে যখন প্রধানতঃ এইসবে সাদৃশ্য কল্পনা করা হয় তখন আমাদের বলতে অসুবিধা হয় না যে উপমাই এদের 'মূলীভূত' অলঙ্কার। স্বীকার্য মূল উপমার অবয়ব শিথিল, উৎপ্রেক্ষা সেদিক থেকে দৃঢ়বদ্ধ, আর রূপকে তো উপমেয় উপমানের অভেদী কল্পনার ঘনীভূত রূপ প্রত্যক্ষ, কিন্তু সবগুলিই উপমা-প্রকৃতি-সম্ভুত অর্থাৎ এক কথায় সবগুলিই উপমা।

উপমা-প্রয়োগ কবিকল্পনার একটা সনাতন রীতি হলেও কাব্য প্রেরণার মূল প্রবৃত্তি তাতে রক্ষিত। এ ব্যাপারে সমালোচকদের মত হলো এই, "উপমা যেন কবিগণের স্বাভাবিক বাক-ভঙ্গি—সে যেন ভাবের অলঙ্কার নয়, তাহার যথাযথ প্রকাশ—যাহা অনির্বচনীয়, তাহাকে চিত্রিত করিবার একমাত্র উপায়।"[১৯] এ থেকে বোঝা যাচ্ছে কবি ভাষার একটি অপরিহার্য অঙ্গ হচ্ছে উপমা। কবির যা বর্ণনা, তা শুধু যথা-যথের বর্ণনা নয়, এর মধ্যে অতিশয়োক্তি প্রচুর। কবিমন কখনো সাদামাটা বর্ণনায় তৃপ্ত নয়, এজন্য সৃষ্টি হয় বিশেষণ, যার উদ্দেশ্য ভাষাকে প্রসাধন-চর্চিত করা। হৃদয়াবেদনের দিক থেকে এ ভাষার বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। উপমা সদর্থে 'বিস্তারিত বিশেষণ'। 'কালো চুল' না বলে যদি বলা হয় 'ঘন মেঘের মতো চুল' তাহলে ভাষাকে আরো কাব্যিক করে তোলা হয়। সেখানে কল্পনাকে যেমন করে তুলছি ব্যাপক, ভাষাও তেমনি হয়ে উঠছে গতিময়, ব্যঞ্জনাধর্মী ও চিত্রাত্মক। যে বস্তু আমাদের নাগালের বাইরে তাকেই করা হলো 'সসীম' ভাষার অঙ্গীভূত। কবিতার ক্ষেত্রে এখানেই উপমার প্রাধান্য। শিল্পরস অস্বাদনের ব্যাপারে স্মৃতির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের অভিজ্ঞতা যা আমাদের দেখা-শোনা-জানা ও উপলব্ধির ফল, তা স্মৃতিকে গভীর ও জীবন্ত করে তোলে। এজন্য আমরা যা বলতে চাই তা সোজাসুজি বলি না, অভিজ্ঞতার রাজ্য হাতড়ে সমজাতীয় কোন অনুভূতির আলোকে বর্ণনীয় বিষয়কে ব্যক্ত করি। সন্দেহ নেই এখানে বক্তব্যবিষয়কে একটু বেশী করে বলা হয়, বিস্তারিত বৈচিত্র্যে তাকে সংস্থাপিত করা হয়, তবুও স্বীকার করবো বর্ণনীয় বিষয়কে এতে ভালোভাবেই বলা হয়। ঠিক এ কারণেই ভাষা

হয়ে ওঠে উপমাত্মক। ইংরেজ কবি শেলীর মতামত এ ব্যাপারে প্রণিধানযোগ্য, তিনি বলেছেন কবিতার ভাষা বেশীর ভাগই উপমাত্মক।[২০] উপমা এই অর্থে "রীতিগত অলঙ্কারও নয়, বিশেষণের মতোই ভাষার মৌল দেহে প্রোথিত। সেই কারণে রক্তমাংসের অংশ, তাকে বাদ দিয়ে ভাষা কোন ক্ষেত্রে আপন কার্য সাধন করতে পারে না। অল্ডাস-হাক্সলি তাঁর সম্পাদিত কাব্যসঙ্কলনে খুব একটা খাঁটি কথা বলেছেন—'কোনো জিনিস বর্ণনা করবার সবচেয়ে ভালো উপায় কখনো সখনো অন্য জিনিস বর্ণনা করা'। এখানে উপমার অপরিহার্যতাই স্বীকৃত হয়েছে।"[২১]

মোটামুটি ভাবে বলা চলে শব্দ যদি কবিতার শরীর হয়, তাহলে উপমা হচ্ছে তার প্রাণ, যেহেতু উপমা ভাব-নির্ভর। শ্রেষ্ঠ গদ্য নিদর্শনে শব্দের ব্যবহারিক দিকটাই স্পষ্ট, কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবিতায় যে শব্দ-ব্যবহার তার মধ্যে রয়েছে 'আশাতীতের নিরন্তর প্রত্যাশা' ও গভীর রহস্যময়তা—আমাদের সাধারণ বুদ্ধির আওতায় তার স্বরূপ নির্ণয় অনেকটা দুরূহই বলতে হবে। উপমা সেই রহস্যমরতা ও প্রত্যাশাকে কাব্য-সম্ভবপরতার মধ্য দিয়ে কবিতাকে রহস্যাবৃত অথচ পরিপূর্ণ রূপ দিতে সক্রিয়। কবিতায় উপমা ব্যবহারের মুখ্য উদ্দেশ্য দ্বিবিধ—এক, কাব্যশরীর ও কবি ভাষাকে সুষম ও বর্ণাঢ্য করা; দুই, ইঙ্গিতময়তা সৃষ্টি করা। ইঙ্গিতময় উপমা কবিতার মূল ভাবনাকে প্রগাঢ় করে তোলে এবং এর বিশেষত্ব হলো সেখানে 'উপমেয় ও উপমানে কোন যান্ত্রিক যোগ থাকবে না, একটি তির্যকভাবে অন্যটির প্রান্ত স্পর্শ করে চলে যাবে।'[২২] এমনিতেও ভালো উপমা সম্বন্ধে যে কথাটি বলা যায় তা হলো সেখানে উপমেয়ই 'আলোকিত' হয়ে ওঠে, এ জন্য উপমানকে হতে হয় অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত। উপমার, মধ্যে উপমেয় অংশ যেন কঙ্কাল, তাতে রক্তমাংসের সঞ্চার করে উপমান, অন্তত কাব্যামোদী পাঠকের কাছে এ সত্য প্রতীয়মান হওয়ার কথা। শুধু 'চোখ' বললে আমরা যা বোঝার তা বুঝে ফেলি নিমেষে, সেখানে আমাদের কল্পনাও অকারণে উদ্দীপ্ত হয় না; কিন্তু যখন বলি 'পাখীর নীড়ের মতো চোখ' তখন সেই 'চোখ' হাজার প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের ভাবনাকে সচকিত করে। এই জাতীয় উপমার বৈশিষ্ট্য হলো এটি রচনাকে করে চিত্রধর্মী এবং কখনো কখনো বিমূর্ত ভাবকে ইন্দ্রিয় বেদ্য রূপ দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত শুভ্র যেন সে নবনী'[২৩] উপমাটিতে শরৎকালের জলহীন সাদা মেঘকে সাদা ননীর সাথে তুলনা করা হয়েছে বলে শুধু যে গুণগত দিক রক্ষিত হয়েছে এমন নয়, ইন্দ্রিয়বেদ্যতার পরিচয়ও সাথে সাথে রয়েছে। আমাদের ইন্দ্রিয়কে যে কবি অত্যন্ত সঘনভাবে নাড়া দেন সেই জীবনানন্দের কবিতাতে এই জাতীয় উপমার প্রচুর উদাহরণ আমরা পাই।

'আতার ক্ষীরের মতো সোহাগ সেথায় মিশে আছে'[২৪], 'কচি বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস — তেমনি সুঘ্রাণ',[২৫] 'জলের রঙের মতো স্বচ্ছ রোদ'[২৬] ইত্যাদি উপমা কখনো বর্ণ, কখনো গন্ধ, কখনো বা স্পর্শের স্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়। আধুনিক উপমায় চিত্রধর্মের প্রাধান্য তো আছেই, তার চেয়ে বড় কথা হলো বিমূর্ত ভাবসৃষ্টির মাধমে সংকেত প্রদানই এর সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের 'বিদায় বেলা এলো মেঘের মতো ব্যেপে'[২৭], জীবনানন্দের 'উটের গ্রীবার মতো কোন এক নিস্তব্ধতা'[২৮] বা 'অন্ধকার প্রেরণার মতো মনে হয় দূর সাগরের শব্দ'[২৯] প্রভৃতি উপমা গভীর ইংগিতবহ। আমরা এখানে উপমেয় উপমানের আনুপাতিক সম্বন্ধ বা যাথার্থ্য নিয়ে সময় ব্যয় করিনে, উপমেয় উপমানের বাইরে ভিন্নার্থক এক ব্যঞ্জনায় আমরা অভিভূত হই, স্বপ্নাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। ক্লাসিক উপমার প্রধান বৈশিষ্ট্য বিষয়ের ব্যখ্যা, সেখানে কবির হৃদয়ানুভূতির গভীর কোন পরিচয় নেই আর এখানে উপমানকে বর্ণাঢ্য করা হয় যতখানি, উপমেয়কে ততখানি নয়। হোমার ইত্যাদি ক্লাসিক কবিদের কাব্যে এই উপমা-লক্ষণ বেশ স্পষ্ট। 'ইলিয়ডের একটি উপমা থেকে ব্যাপারটি বোঝা যাচ্ছে—

> আহারের পাত্র সংলগ্ন দড়ি ছিঁড়ে অশ্ব মুক্তির আনন্দে ছুটে যায় মাঠের দিকে, নদীর তীরে যে নদীতে সে কতবার গা ধুয়েছে। মাথা উচুঁ করে সে দাঁড়ায়। ঘাড়ের কেশর বাতাসে উড়তে থাকে। কি সুন্দর সে। আবার সে ছুটে যায়। খুরের আঘাতে মাটি কেঁপে উঠে। সে ছুটে যায় ঘোটকীদের চারণ ভূমিতে।— দেবতার কথা শুনে হেক্টরও ঠিক তেমনি করেই ছুটে যান যুদ্ধে, রথ বাহিনী পরিচালনার জন্য। (ইলিয়ড, পঞ্চদশ খণ্ড)[৩০]

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে উপমান কতখানি বিস্তৃতিধর্মী ও ব্যাখ্যাত্মক। স্বীকার্য উপমেয় উপমানের সাযুজ্যে একটা সম্পূর্ণ ভাব জন্ম নেয় উপমায়, কিন্তু ক্লাসিক উপমায় বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে সে ভাবের জন্ম। ক্লাসিক কাব্যে দ্বিবিধ উদ্দেশ্যে উপমা সৃষ্টি হয়; এক ভাব বিশ্লেষণের জন্য; দুই ঘটনার প্রকাশমান রূপের তীব্রতা বা গভীরতা বোঝাবার জন্যে।[৩১]

বংলা সাহিত্যে ক্লাসিক রীতির চরম প্রকাশ মধুসূদনে। তাঁর উপমার মধ্যেও আমরা পাই বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা। মধুসূদন কাব্যের ভাববস্তুর প্রেরণা যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্য বিশেষতঃ গ্রীক সাহিত্য থেকে নিয়েছেন, তেমনি ভাষা রীতিতেও অনেকাংশে

সে সাহিত্যকে অনুসরণ করেছেন। উপমা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও একই অনুবর্তন লক্ষণীয়। যুদ্ধক্ষেত্রে হাজার হাজার গতায়ু রাক্ষস সৈন্যদের দেখে রাবণের আক্ষেপ,

হায়রে, যেমতি
স্বর্ণচূড় শস্য ক্ষত কৃষীদল বলে,
পড়ে ক্ষেত্রে, পড়িয়াছে রাক্ষস নিকর
রবিকুল রবি শূর রাঘবের শরে।[৩২]

এই জাতীয় উপমায় কবিকল্পনার নতুনত্ব নেই যে এমন নয়, বরং কবি যা বলতে চেয়েছেন তা অন্য কোন ভাবে এমন দেশজ অভিজ্ঞতা সম্পন্নতার মধ্য দিয়ে মনোরম করা যেতো না, তথাপি এ উপমাতে রহস্যের কোন সন্ধান পাই না, পাই শুধু প্রতীয়মানকে কত সুন্দর ভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে তার বিচিত্র কারুকলা। উপমা সৃষ্টির ব্যাপারে যে কলিদাসের নাম অমর হয়ে আছে এবং 'উপমা কালিদাসস্য' বলে যে প্রতিষ্ঠিত প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে তাতেও আমরা রহস্যময়তা দেখিনা, স্বাভাবিক লক্ষণগুণে পরস্পরের অনুরূপ বস্তুগুলিকেই কালিদাস ঐক্যসূত্রে গেঁথেছেন। 'মেঘদূতে' যক্ষ গমন পথের বর্ণনা দিতে গিয়ে এক জায়গায় মেঘকে বলছে,

দেখবে নদী এক বিন্ধ্যাইশলের উপল বন্ধুর চরণে
হাতির গায়ে আঁকা চিত্রলেখা যেন শীর্ণরেবা সেই বিসর্পিতা।[৩৩]

বিন্ধ্য পর্বতের গা বেয়ে যে রেবা নদী বয়ে চলেছে তা যেন হাতীর গায়ের আঁকা বাঁকা রেখা। চিত্রধর্মী উপমা হিসেবে মনোমুগ্ধকর হলেও স্বাভাবিকের বাইরের কোন সম্ভাবনার শিহরণ আনে না; যে সমস্ত উপমা সংস্কৃত কবিদের কাব্যপ্রেরণার গতানুগতিক উৎস, যেমন 'মেঘের মতো চুল', 'সাপের মতো বেণী', 'চাঁদের মতো মুখ', 'হরিণীর মতো দৃষ্টি' কিংবা 'বিম্বের মতো অধর' ইত্যাদি, এতই প্রথাসিদ্ধ ও আটপৌরে যে এ গুলোকে বিশ্লেষণ করার দরকারই হয় না। কালিদাস যে এ জাতীয় উপমার শরণাপন্ন হননি এমন নয়, তথাপি বলতে হয় তাঁর প্রতিভার যাদু স্পর্শ নতুন নতুন রূপ-চিত্রের সন্ধান দিয়েছে। তাঁর অধিকাংশ উপমাই চিত্রধর্মী এবং এই গুণটি 'মেঘদূত' ইত্যাদি কাব্যকে এমন বর্ণবহুল ও সুষম ভাষায় প্রকাশ করেছে যাতে সকল পাঠকের কাছে তা আবেদনগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে। উপমা ব্যবহারের

এই ক্ষমতা চিত্তচমৎকারিত্বের নিদর্শন এবং কালিদাসের অধিকাংশ উপমাই চিত্ত-চমৎকারী। কিন্তু তথাপি বলতে হয় কালিদাসের উপমা সন্ধানধর্মী নয়, নির্দিষ্ট প্রথার মধ্যেই তার চলমানতা, তার কৃতিত্ব, সার্থকতা, সবকিছুই। এ কথায় কালি-দাসের সমুন্নত প্রতিভাকে ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে না, ক্লাসিক রীতির ধরণই তা। ক্লাসিক কাব্যের প্রকরণে কাব্যিক শৃঙ্খলাকে পুরোপুরি বজায় রাখা হয় এবং সাথে সাথে তাকে করে তোলা হয় 'বুঝে ওঠার মতো'—অলঙ্করণের পারিপাট্যে যার উন্মুক্ত সৌন্দর্য সহজেই প্রতীয়মান হওয়ার কথা। ক্লাসিক ধর্মীতার এই বিশেষ রীতি কলিদাসের স্বীকৃত ও প্রস্ফূটিত কৃতিত্ব উপমা সৃষ্টিতে নিবিড়ভাবে পালিত হয়েছে।

রোমান্টিক কবিকল্পনায় উপমা সৃষ্টিতে আবিষ্কার প্রবণতাই লক্ষণীয়, সেখানে ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যঞ্জনা বেশী, প্রকাশের চেয়ে অনুভূতি বেশী কিংবা সৌন্দর্যের চেয়ে লাবণ্যের। আত্মগত গভীর প্রেরণাজাত বলে এ জাতীয় উপমাতে উপমেয় উপনানে ভাবগত দূরত্বও স্পষ্ট, এখানে প্রতীকী ব্যঞ্জনাই প্রধান — আলো আঁধারি ভাবের অনুকল্পে যা গভীরতম ইংগিতবহ। রোমান্টিক উপমায় দৃশ্য ও অদৃশ্য, দূর ও নিকট, অতীত ও বর্তমান এ সমস্ত ভেদ অর্থহীন। চেনা জগতের মধ্য দিয়ে অচেনা জগতের উন্মোচন সে যেন এ শ্রেণীর উপমার শ্রেষ্ঠ দিক। বুদ্ধদেব বসু বলেন, "রোমান্টিক আর্ট আমাদের শিখিয়েছে বাহিরিন্দ্রিয়ের প্রতি দাস্য ভাব থেকে মুক্ত হতে, তার শ্রেষ্ঠ প্রতিভূদের রচনায় আমরা দেখেছি, কেমন করে কবির চিত্তে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমান্তরেখা ভেঙ্গে যায়, সব বিপরীত অন্বিষ্ট হয়ে ওঠে, কবি আমাদের জন্য জয় করে আনেন অজানাকে—যে-জয়ের উল্লাসে বোদলেয়ার অনুভব করেছিলেন এমন সব গন্ধ, যার কোনোটি 'শিশুর মাংসের মতো সতেজ', কোনোটি 'সুরজ নিস্বনের মতো কোমল', কোনোটি বা 'প্রান্তরের মতো সবুজ', আর এমন সব প্রতি-ধ্বনি যা রাত্রি ও স্বচ্ছতার মতো বিশাল।'[৩৪] জীবনানন্দের মতো কবিরা যাঁরা অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে স্মৃতির অবচেতনে আত্মলীন থাকেন তাঁদের পক্ষে বোদলেয়ারের মতো দুঃসাহসী হওয়া সম্ভব উপমা সৃষ্টিতে। জীবনানন্দের অনেক উপমা স্বাদে গন্ধে অপরূপ। তাঁর কাছে ভোর 'ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ', আকাশের রং 'ঘাস ফড়িংয়ের মতো কোমল নীল'. আর সেখানে সন্ধ্যা আসে শিশিরের শব্দের মতো'। রবীন্দ্রকাব্যে বোদলেয়ারীয় উপমা প্রকৃতি খুঁজে নেওয়া যায়, তাঁর উপমা বর্ণে ও গন্ধে ধরা যে দেয় না এমনও নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা হলো এই তাঁর উপমা ইন্দ্রিয়াতীতের কোন গভীরের প্রতি যেন

ইংগিতকৃত। সেদিক থেকে তিনি ভাববাদী। তাঁর কবিতার মধ্যে যেমন, তেমনি উপমাতেও একটি সম্মোহিত ভাবকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় বাংলা সাহিত্যে উপমায় নতুন দিকের উন্মোচন করেন রবীন্দ্রনাথ, বাংলা সাহিত্য এতদিন ইন্দ্রিয়বেদ্য জ্ঞভিজ্ঞতার বাইরে যায়নি, রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই রোমান্টিক কার্যকারিতার স্বভাব লক্ষণ স্পষ্ট হয়েছে।

পাদটিকা

১ চিত্রাঙ্গদা | প্রবন্ধ সংগ্রহ — প্রথম চৌধুরী
পুনর্মুদ্রন মে ১৯৬১, পৃ ১৬৪

২ উপমা কালিদাসস্য — শশিভূষণ দাশগুপ্ত
নব সং ১৩৬৩, পৃ ৬

৩ Poetry takes its origin in emotion recollected in tranquillity.

৪ কবিতার কথা — জীবননান্দ দাশ
২য় সং, পৃ ৩৯

৫ সার্থক বেদনা | গীতিমাল্য — রবীন্দ্রনাথ

৬ ঘাস | বনলতা সেন — জীবনানন্দ দাশ

৭ কবি ও কাব্য | সাহিত্য বিচার — মোহিতলাল মজুমদার

৮ কাব্য জিজ্ঞাসা, — অতুল চন্দ্র গুপ্ত
২য় সং, পুনরমুদ্রন জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ পৃ ২২

৯ উপমা কালিদাসস্য, — শশিভূষণ দাশগুপ্ত
পূর্বোক্ত, পৃ ৯

১০ সাহিত্যধর্ম | সাহিত্যের পথে — রবীন্দ্রনাথ

১১ মেঘদূত | উত্তর মেঘ ৮৫ — কালিদাস

১২ বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত, কালিদাসের মেঘদূত' দ্রঃ

১৩ মেঘনাবধ কাব্য, ষষ্ঠ সর্গ — মধুসূদন

১৪ বর্ষামঙ্গল | কল্পনা

১৫ আবির্ভাব | ক্ষনিকা

১৬ উপমা কালিদাসস্য, পূর্বোক্ত, পৃ ২৭ — শশিভূষণ দাশগুপ্ত

১৭ সাহিত্যর নানা কথা — হর প্রসাদ মিত্র
১ম প্রকাশ ১৩৬৩ পৃ ৮৯

১৮ হে মহাজীবন | ছাড়পত্র — সুকান্তভট্টাচার্য

১৯ কবি ও কাব্য | সাহিত্যবিচার — মোহিতলাল মজুমদার

পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩

২০ Language is highly metaphorical

২১ গল্পগুচ্ছের রচনারীতি

২২ কালিদাসের মেঘদূত — বুদ্ধদেব বসু

২৩ শরৎ | কল্পনা

২৪ বনের চাতক-মনের চাতক | ঝরা পালক

২৫ ঘাস | বনলতা সেন

২৬ আবহমান | শ্রেষ্ঠ কবিতা

২৭ ৪০ নং কবিতা | উৎসর্গ

২৮ আট বছর আগের একদিন | শ্রেষ্ট কবিতা

২৯ শ্যামলী | বনলতা সেন

৩০ He was like a stallion who breaks his halter at the manger where they keep and fatten him, and gallops off across the fields in triumph to his usual bathing-place in the delightful river. He tosses up his head, his mane flies back along his shoulder ! he knows how beautiful he is, and why he goes, skimming the ground with his feet, to the haunts and pastures of the mares. Thus Hector sped away, when he had heard God speak, to lead his charioteers to battle. (Illiad ; Book XV) — E. V. Rien এর ইংরেজী অনুবাদ থেকে বঙ্গানুবাদ করেছেন সৈয়দ আলী আহসান। তাঁর 'কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদধব কাব্যে উপমা' দ্রষ্টব্য।

৩১ There are two main purposes for which similies may be introduced. First, that of illustrating the mode. Secondly, that of making the degree in which an action or object is exibited.

কবি মধুসূদন—সৈয়দ আলী আহসান, পূর্বোক্ত

৩২ ১ম সগ —মেঘনাদবঠ কাব্য

৩৩ পূর্বেমেঘ ১৯—বুদ্ধদেব বসু কর্তৃক অনূদিত 'কালিদাসের মেঘদূত' দ্রষ্টব্য।

৩৪ কালিদাসের মেঘদূত, পূর্বোক্ত পৃ ৬১

দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্র কাব্য ঃ উপমা

রবীন্দ্রকাব্যে উপমা প্রয়োগের তাৎপর্য এবং এর বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আলোচনার বিস্তীর্ণ পর্যায়ে এসে রবীন্দ্র মানসের স্বরূপ বিশ্লেষণ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। উপমা প্রয়োগ কবিকল্পনার বিশিষ্ট দিক, কবিতায় উপমা প্রয়োগের প্রধান উদ্দেশ্য ভাবনার রূপায়ন ও প্রসারণ এবং এ ব্যাপারে কবির মানসিকতাই পটভূমি হিসেবে কাজ করে। কোন ধরণের উপমা বা কি প্রকৃতির উপমা তিনি সৃষ্টি করবেন সে ব্যাপারেও একই মানসিকতা কার্যকর। রবীন্দ্র-উপমা সম্বন্ধে এখনকার আলোচনা কাব্যধারার সাথে সঙ্গতিসম্পন্ন, সেদিক থেকে রবীন্দ্র মানসের বিস্তারিত বিবরণ নেই, আছে শুধু রূপরেখা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যগ্রন্থ 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে আরম্ভ করে 'শেষলেখা' পর্যন্ত বিভিন্ন কাব্যগুলিকে আলোচনার সুবিধা ও শৃঙ্খলার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করছি।

এক, 'সন্ধ্যা সংগীত' থেকে 'মানসী'
দুই, 'সোনার তরী' থেকে 'ক্ষণিকা'
তিন, 'নৈবেদ্য' থেকে 'খেয়া'
চার, 'বলাকা'
পাঁচ, 'পূরবী' থেকে 'পরিশেষ'
ছয়, গদ্যকাব্য — 'পুনশ্চ' থেকে 'শ্যামলী'
সাত, 'প্রান্তিক' থেকে 'শেষলেখা'।

পর্যায়ক্রমিক আলোচনার লক্ষ্য উপমার ক্রমবিকাশের রূপ লক্ষণ নির্ণয়। রবীন্দ্র-উপমার অন্যান্য দিকগুলোও রয়েছে, সেগুলি পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত।

এক, 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে 'মানসী'

'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবনের সূত্রপাত এ কথা বিশিষ্ট সমালোচকরা যেমন বলেন তেমনি কবির কথাতেও তার সম্পুর্ণ সাক্ষ্য রয়েছে। 'সন্ধ্যা সংগতে'র পূর্ববর্তী কাব্য সাধনাকে নিজের রচনা বলতে রবীন্দ্রনাথের লজ্জা ও সংকোচের

অন্ত ছিল না। 'জীবন স্মৃতি'তে এবং রবীন্দ্র-রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে এগুলোকে তিনি 'কাব্যরচার সংস্কার' বলে উল্লেখ করেছেন এবং শিল্প হিসেবে এ সবের মূল্য যে কত অকিঞ্চিৎকর 'ভানুসিংহের পদাবলী' সম্পর্কে কবির নিজস্ব মন্তব্য থেকে তা বোঝা যাবে,

> ভানুসিংহের কবিতা একটু বাজাইয়া বা কষিয়া দেখিলেই তাহার মেকি বাহির হইয়া পড়ে। তাহাতে আমাদের দিশি নহবতের প্রাণ গলানো ঢালা সুর নাই, তাহা আজ কালকার সস্তা অর্গানের বিলাতি টুংটাং মাত্র।[১]

কিন্তু কবিপ্রকৃতি গঠনে 'সন্ধ্যাসংগীত' পূর্ববর্তী কাব্য সাধনার মূল্য একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হয়তো তখন কল্পনার দৈন্য ছিল, বস্তু নির্বাচনে অক্ষমতা ছিল, ছন্দ কৌশলের বিচিত্র দিকও অজানা চিল, ভাষাও হয়তো বা তেমনি ছিল অপরিণত,—কিন্তু এ কথা আমাদের ভুলবে চলবে না যে 'সন্ধ্যাসংগীত' পূর্ববর্তী রবীন্দ্র কাব্য ফসল মোটেই কম নয়, যে কোন কম শক্তির কবির কাছে পর্যাপ্ত সৃষ্টির কারণও হতে পারে। আজকের দিনে এ সব কাব্য, যেমন 'ভগ্নহৃদয়', 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' 'বাল্মিকী-প্রতিভা' ইত্যাদির কাব্যিকতাও খুঁজে নেওয়া হচ্ছে। কবি যখন এ সব রচনা করেন বয়স তখন বার থেকে কুড়ি বছর অর্থাৎ কৈশোর ও কৈশোর-উত্তীর্ণ তারুন্যের সময়কাল। বয়সের ধর্ম আবেগাতিশয্য এনেছে, উচ্ছ্বাস এনেছে, কিন্তু কল্পনার পরিশুদ্ধতায় স্থিতধী রূপ পায়নি। সমকালীন হৃদয়রূপকে পেতে হলে কবির কথার স্মরণ নিতে হয়, 'ভগ্নহৃদয়' সম্বন্ধে জীবনস্মৃতিতে কবি লিখেছেন—

> শিশুদের দাঁত যখন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে তখন সেই অনুদ্ভাত দাঁতগুলি শরীরের মধ্যে জ্বরের দাহ আনয়ন করে। সেই উত্তেজনার সার্থকতা ততক্ষণ কিছুই নাই যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁতগুলা বাহির হইয়া বাহিরের খাদ্য পদার্থকে অন্তরস্থ করিবার চেষ্টা না করে। মনের আবেগগুলারও সেই দশা।[২]

এ বয়সটা হচ্ছে ভাবাকুলতায় বয়স, আতিশয্যে সবকিছুর প্রকাশমানতার প্রবল প্রেরণার বয়স। কিন্তু আবেগের তাড়না যতখানি ছিল, প্রকাশ কৌশল ততখানি আয়ত্ব হয়নি। এই আবেগ শুধু উচ্ছ্বাসের বাষ্পে পরিণত হয়েছে, ঘনগভীর কোন আবহ সৃষ্টি করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক কাব্যগুলির উপরোক্ত অসঙ্গতিগুলো প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দিলেও এবং রবীন্দ্রনাথের নিজের বিচারে সেগুলোর কাব্যিক

স্বীকৃতি না থাকলেও সমালোচকের দৃষ্টিতে রবীন্দ্র কবি প্রতিভার প্রাথমিক রূপ লক্ষণের পটভূমি হিসেবে সে কাব্যগুলোর স্বাভাবিক তাৎপর্য উল্লেখযোগ্য। নীহার রঞ্জন রায় বলেন, "যে আবেগময় সুর, যে গীতধ্বনি, যে অব্যাহত গতিচ্ছন্দ রবীন্দ্র কাব্যের বৈশিষ্ট্য, যে অবারিত মুক্তপক্ষ কল্পনা ও তাহার একান্ত স্বতন্ত্র অন্তর্মুখী প্রকৃতি রবীন্দ্র গীতিকবিতার ধর্ম তাহারও প্রথম উন্মেষ ইহাদের মধ্যে পরিস্ফুট।"[৩]

এই প্রাণধর্ম হচ্ছে জীবন ও জগত সম্বন্ধে কবির ব্যক্তিগত ধারণা। রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে যথার্থ অর্থে প্রথম গীতিকবি। বিহারীলালকে আমরা এর প্রবক্তা রূপে জানি। বিহারীলালের কাব্যে বাহিনিরপেক্ষ আত্মলীন ভাবমূর্তি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এ কথা সত্যি হলেও বলতে হয় তাঁর কাব্যে বহির্জগতের সাথে অন্তর্জগতের মিলন সাধনা সার্থক হয়নি। অথচ এই মিলন পালার মধ্যে আছে রোমান্টিক প্রাণধর্মের মৌল উৎস। নিজের অন্তরে একটা ভাবজগৎ সৃষ্টি করে কবি তাতেই লীন থেকেছেন, এ কারণে বিহারীলালের কবিস্বভাব মরমী চেতনায় সার্থকতা লাভ করতে চেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে প্রথম জীবনে বিহারীলালের কবিতাদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন এ কথা জীবন স্মৃতিতে তিনি বলেছেন।[৪] বিহারীলালের সাথে ঠাকুর পরিবারের সম্পর্ক ছিল নিবিড়, সেই সূত্রে বালক বয়স থেকেই রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের কবি-স্বভাব সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন। উত্তর জীবনে কাব্যসৃষ্টির প্রাচুর্যে, বিভিন্ন বৈচিত্র্যে রবীন্দ্রনাথ যে বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তার প্রেরণা রোমান্টিক গীতি-চেতনা এবং এর সুর খুঁজে পেয়েছিলেন বিহারীলালের কাব্যে যদিও পাশ্চাত্য রোমান্টিক কবিদের কাব্যও পড়ে নিয়েছিলেন সেই তরুণ বয়সে, পারিবারিক ঐতিহ্য-সূত্রে। দেশি-বিদেশী সাহিত্য-সংস্কৃতির সাথে পূর্ব পরিচয়ের সার্বিক সুযোগ সঞ্জাত সেই পারিবারিক ঐতিহ্য। শেক্সপীয়র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী, কিট্‌স্ প্রভৃতি ইংরেজ কবিদের কাব্য সাধনার সাথে তাঁর পরিচয় ছিল যেমন ঘনিষ্ঠ পর্যায়ের, তেমনি ভারতীয় সাহিত্যের পূর্বতন বিশিষ্ট কবি কালিদাস, জয়দেব এবং বৈষ্ণব কবিগণের সাথেও। বৈষ্ণব কবিতার ভাষা ও ছন্দে তিনি এতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন যে 'ভানুসিংহ ঠাকুর' ছদ্মনামে অনেক পদাবলী রচনা করেছেন পরিবেশ ও আবহ অক্ষুন্ন রেখে। এ সব প্রভাব সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট রেখে যে কথা বলতে হয় তা হলো রবীন্দ্রনাথ যখন নিজের সুরটি খুঁজে পান তখন তা প্রকাশে চরিতার্থতা লাভ করেছে কবির নিজের মতো করে।

রবীন্দ্র কাব্যের প্রাথমিক পটভূমির উপরোক্ত সুদীর্ঘ বিবরণের উদ্দেশ্য রবীন্দ্র উপমার প্রথম পর্যায় সম্বন্ধে একটা ধারণা সৃষ্টি এবং উপমার ক্রমবিকাশের সূত্রটি খুঁজ নেওয়া। 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'ভগ্ন হৃদয়' ইত্যাদি কাব্যে ভাব ভাষা ও ছন্দে বিহারী-লালের অনুকরণ লক্ষণীয়, কখনো কখনো মাইকেলী ঢঙও পরিলক্ষিত। উপমা সৃষ্টিতে সে অনুকরণের পরিচয় আছে। যেমন বিহারীলালের,

প্রাণের সমুদ্র এক আছে যেন এ দেহ-মাঝারে
মহা উচ্ছ্বাসের সিন্ধু রুদ্ধ ঐ ক্ষুদ্র কারাগারে। [ভগ্নহৃদয়

মাইকেলের,

উর্মিহীন নদী যথা ঘুমায় নীরবে
সহসা করুণ ক্ষেপে সহসা জাগিয়া উঠে চল-উর্মি সবে। [বনফুল

এ ধরণের মামুলী উপমার নিদর্শন প্রচুর প্রথম জীবনে। মাইকেলের বিবৃতিধর্মী উপমা-রীতি রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন কোন কোন জায়গায়, বিশেষতঃ তাঁর আখ্যায়িকা প্রধান কাব্যগুলিতে।

'সন্ধ্যাসংগীত' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের আত্মচেতনার প্রথম প্রকাশ ঘটে। পূর্বতন কাব্যগুলো কাহিনী প্রধান—কবির যা বক্তব্য নিজস্ব নয়। 'সন্ধ্যাসংগীতে'ই কবি নিজের জবানীতে কবিতা লেখেন অর্থাৎ এখন থেকেই রবীন্দ্র কাব্য মন্ময় চেতনাকে প্রকৃষ্টরূপে ধারণ করে। 'সন্ধ্যাসংগীত' সম্বন্ধে কবি নিজে বলেছেন,

> তাকে আমের খোলের সঙ্গে তুলনা করবো না, করবো কচি আমের গুটির সঙ্গে, অর্থাৎ তাতে তার আপন চেহারাটা সবে দেখা দিয়েছে শ্যামল রঙে। রঙ ধরেনি, তাই তার দাম কম। কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল। অতএব সন্ধ্যাসংগীতেই আমার কাব্যের প্রথম পরিচয়। সে উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু আমারই বটে।[৫]

কিন্তু এখনো রবীন্দ্রনাথ অনুকরণের পর্যায়কে সর্বাংশে অতিক্রম করতে পারেন নি। হৃদয় এখনো আবরুদ্ধ, প্রকাশের পথহারা। উপমাও তেমনি অবরুদ্ধতায় আচ্ছন্ন। কবিতাকে তিনি কল্পনা করেছেন আকাশ-কন্যা রূপে, মেঘের দেশে যার অধিবাস।

তাঁর হৃদয়ে কবিতা আপন স্থান করে নিক এটা করির কামনা,

মেঘ হতে নেমে ধীরে ধীরে
আয়লো কবিতা মোর বাসে।
চম্পক-অঙ্গুলি দুটি দিয়ে
অন্ধকার ধীরে সরাইয়া
যেমন করিয়া ঊষা নামে। [গান আরম্ভ

কিন্তু কবিহৃদয় দুঃখ ভারাক্রান্ত, পরিত্যক্ততার বেদনায় মুহ্যমান — কবিতাকে হৃদয়-সাথী করার পর সমস্ত বিশ্বসংসার যেন তাঁকে ত্যাগ করে চলে গেছে,

একবার ফিরে কেহ দেখে নাকো তুলি
সবে চলে যায়।
পুরানো মলিন ছিন্ন বসনের মতো
ফেলে চলে গেল;
কাতর নয়নে চেয়ে রহিলাম কত
সাথে না লইল। [পরিত্যক্ত

কিন্তু কবি অনুগ্রহের প্রত্যাশী নন, করুণার আকাঙ্খিত নন। তিনি মনে করেন,

অনুগ্রহ পাষাণ — মমতা
করুণার কঙ্কাল কেবল
ভাবহীন বজ্রে গড়া হাসি
স্ফটিক কঠিন অশ্রুজল। [অনুগ্রহ

তিনি ভালোবাসা চান, যে ভালোবাসা 'স্বাধীন মহান' 'পর্বত সমান' এবং যার অসহ্যতায় তাঁর মন 'পাগলের হেন'। ভালোবাসার অসহ্যতার পরিচয় কবি দিয়েছেন পরবর্তী কোন কোন কাব্যে, প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনা বিশ্লেষণে সে পরিচয় বিধৃত হবে। সন্ধ্যাসংগীতে ভাব অঙ্কুররূপেই পর্যবসিত, সেদিক থেকে উপমাও যে কত-খানি 'নাজুক' তা দেখা গেছে। এ কাব্যে কবির বিষন্ন মানসিকতার করুণ আবহে হৃদয় প্রকাশের পথ খুঁজে পায়নি। কবি যখন বলেন,

হে বিধাতা, শিশিরের মতো
গড়েছ আমার এই প্রাণ

শিশিরের মরণটি কেন
আমারে করনি দান। [শিশির

তখন একথা আমরা জানি, সুখ না ফুরোতেই শিশিরের মৃত্যু হয়, কিন্তু কবিরও তেমনি ইচ্ছা কেন? 'শিশিরের মরণ' কামনা করেন কেন তিনি? হৃদয়ের ফুটনোন্মুখ সময়ে ঝরাকলির মতো ঝরে পড়তে চাওয়ার এ কেমন মানসিকতা? এর কারণ সন্ধান করতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন, "আসন্ন সৃষ্টি সম্ভাবনার ব্যাকুলতা যেন নবযৌবনের সঙ্গে মিলিয়া কবিকে সঙ্কুচিত, প্রকাশভীরু ও স্পর্শকাতর করিয়াছিল। হৃদয়াবেগের গুটি কাটিয়া বাহির হইবার বেদনা সন্ধ্যাসংগীতের বিশিষ্ট কবিতাগুলিতে গুঞ্জরিত।[৬]

সন্ধ্যাসংগীতের উপমা নির্বাচনে অতি সাধারণত্ব ও গতানুগতিকতা লক্ষণীয়। উপমা কবি ভাবনার বিশিষ্ট দ্যোতক হয়ে ওঠেনি এখানে। 'প্রভাত সংগীতে' উপমার ক্রমবিকাশের ধারা কিছুটা স্পষ্ট। সন্ধ্যাসংগীতে হৃদয়াবেগের যে প্রকাশ অবরুদ্ধতায় মুহ্যমান ছিল, প্রভাতসংগীতে তা মুক্তি পেয়েছে। কবির এখানে আত্মচেতনা লাভ ঘটেছে। প্রাক্তন হৃদয় অপ্রকাশের বিশ্লেষণ করছেন তিনি,

ফেলিস নিশাস মরুর বাতাস
জ্বলিস জ্বালাস কত
আপন জগতে আপনি আছিস
একটি রোগের মত। [আহ্বান সংগীত

কবি বহির্জগতের সাড়া পেয়েছেন, আত্মকেন্দ্রিক ভাববিলাসের মোহের অবসান হতে চলেছে, হৃদয়ের মুক্তি ঘটছে।

আজিকে বাহিরে ভ্রমরের মত
বাহির হইয়া আয়। [আহ্বান সংগীত

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা যা স্মরণীয় হয়ে আছে শুধুমাত্র কবির নতুন জীবনচেতনার অভিপ্রকাশ রূপে, সেখানেও এই 'বাহির হইয়া' আসার তীব্র আবেগ পরিলক্ষিত।

এ আবেগ যেন বাঁধভাঙ্গা কল্লোল, সব কিছু ধুয়ে মুছে নিয়ে যাবার প্রেরণা সম্মত,—

আমি ঢালিব করুণাধারা
আমি ভাঙ্গিব পাষাণকারা
আমি জগত প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
আকুল পাগল পারা।

লক্ষণীয় যে এই কাব্যে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত উপমা ব্যবহার করেছেন তাতে বিষয় আলোকিত হয়েছে। নিম্নোদ্ধৃত কিছু উপমা এ কথার সাক্ষ্য দেবে,

১. তাই বলি প্রাণ ওরে — গান গা পাখীর মত
২. নবীন রবির আলো
.....
প্রভাত ফুলের মতো ফুটায়ে তুলিত মোরে।
৩. হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মতো উঠিতে চায়।
৪. হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মতো হাসিতে চায়।

এইসব উপমা কবি হৃদয়ের বন্ধন মুক্তির সংবাদ জানায়। নাইটিংগল্‌কে 'Full throated ease' এ গান গাইতে দেখে কবি কীটস্‌ বিমুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁর মন স্বপ্নরাজ্যে উধাও হয়েছিল। পাখীর গান আসলে অবাধ স্বাধীনতার আনন্দ। পাখী ভ্রমর ইত্যাদি আবার গতির প্রতীক, ফুল তেমনি বিকাশের, ঊষা তেমনি নতুন দিনের। 'প্রভাত সংগীতে' কবিহৃদয়ের নিরুদ্ধ প্রকাশমানতা এইসব উপমায় ধরা পড়েছে। লক্ষণীয় উপমাগুলির প্রত্যেকটি প্রকৃতি থেকে চয়ন করা। অবশ্য রবীন্দ্র উপমার অধিকাংশই প্রকৃতি - নির্ভর হওয়ার স্বাভাবিকতা রয়েছে ; রবীন্দ্রনাথ কেন, যে কোন মহৎ কবির কাব্যচেতনার মূল পটভূমি প্রকৃতি। প্রভাতসংগীতে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি চেতনার প্রথম প্রকাশ স্পষ্ট স্বরূপ নিয়েছে এ কথা বলা অবশ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয় তবে এ কথা সত্যি এ কাব্যে আবেগতীব্রতা ভাবের রসমূর্তি সৃষ্টি করেনি. আর এও আমাদের জানা আবেগ ও মননের সমন্বয় না হলে ভালো কবিতার জন্ম হয়

না। এ কাব্যের ভাব আবেগ-প্রধান বলে ভাষাও হয়ে উঠেছে তদনুরূপ, অনেকটা অপরিণত। কবি নিজেও বলেছেন,

> কড়ি ও কোমল রচনার পূর্বে কাব্যের ভাষা আমার কাছে ধরা দেয়নি। কাঁচা বয়সে মনের ভাবগুলো নতুনত্বের আবেগ নিয়ে রূপ ধরতে যাচ্ছে, কিন্তু যে উপাদানে তাদেরকে শরীরের বাঁধন দিতে পারতো তারই অবস্থা তখন তরল। এ জন্য এগুলো হয়েছে ঢেউওয়ালা জলের উপরকার প্রতিবিম্বের মতো আঁকাবাঁকা; ওরা মূর্ত হয়ে ওঠেনি, সুতরাং কাব্যের পদবীতে পৌঁছতে পারেনি। সেই জন্যে আমার মত এই যে, কড়ি ও কোমলের পর থেকেই আমার কাব্য রচনা ভালোমন্দ সবকিছু নিয়ে একটা স্পষ্ট সৃষ্টির ধারা অবলম্বন করেছে।[৭]

প্রভাতসংগীতে কাব্যের ভাষা যে ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন হয়ে ওঠেনি এ কথা কবির উক্তিতে প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠেছে। তবে এখানে রবীন্দ্রনাথ উপমা ব্যবহারে নিজস্ব ধারাটি খুঁজে পেয়েছেন বলে মনে হয়। 'চেয়ে থাকা' কবিতায় আছে,

দেখিব পাখী আকাশে উড়ে
সুদূরে উড়ে যায়,
মিশায়ে যায় কিরণ মাঝে
আঁধার রেখা প্রায়।

সুদূর দিগন্তে উড্ডীয়মান পাখীকে অন্ধকার রেখার মতো করার মধ্যে কবিকল্পনার খুব একটা চিত্তাকর্ষকতা যে আছে এমন নয়, তবু রবীন্দ্রনাথের উপমার স্বাভাবিক ভাবচিত্র ও ঔচিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। আর তাঁর মানস চেতচনার বিশিষ্ট দিক 'সুদূর বিপুল সুদূরের' ইংগিতও এ জাতীয় উপমায় রয়েছে। উপমা যেহেতু কবি ভাষার অঙ্গ সেজন্যে তা কবি ভাবনার প্রকাশও, একথা ভোলবার নয়।

ছবি ও গানের কবিতাগুলি কথাচিত্রের মতোই — হৃদয়ের রঙে ও রেখায় আবদ্ধ বিচিত্র চিত্রের সমাবেশ এখানে। চৌরঙ্গীর নিকটবর্তী সার্কুলার রোডের বাগান বাড়ীতে থাকাকালীন নিকটবর্তী লোকালয়ের দৃশ্যগুলো ধরে রেখেছেন এই কাব্যে।[৮] রোদের ঝিকিমিকি খেলা, চাঁদের কিরণ, গাছের ছায়া, ফুলের গন্ধ, পাতা হতে

পাতায় ঝরে পড়া টুপটাপ বৃষ্টির ফোঁটা, ডালে বসে ভেজা একটি পাখী, ছেলে-মেয়েদের খেলা, সুদূর মাঠের পারে একখানি গ্রাম ইত্যাদি বিচিত্র দৃশ্যের ছবি এঁকে এঁকে কবিমন সহজ ও নির্মল আনন্দে নিমগ্ন। উপমার মধ্যেও এই চিত্রের কিছু কিছু পরিচয় আছে।—

১. ঘর দ্বারা সব মায়া ছায়া সম
কাহিনীতে গাঁথা খেলাগুলি
মদুর তপন, মধুর পবন
ছবির মতন কুঁড়েগুলি। [গ্রামে

২. গ্রামখানি মাঠখানি উঁচুনিচু পথখানি
দু' একটি গাছ মাঝে মাঝে,
আকাশ সমুদ্রে সুবর্ণ দ্বীপের
কোথা যেন সুদূরে বিরাজে [মধ্যাহ্নে

৩. ঘুমের মতো মেয়েগুলি
চোখের কাছে দুলিদুলি
বেড়ায় শুধু নুপুর রণরণি [মাতাল

শেষ উপমাটিতে উপলব্ধিজাত মধুর অনুভূতি চিত্রধর্ম থেকে অধিক প্রাধান্য পেয়েছে এবং এ কথাও সত্য রবীন্দ্রনাথ ভাবকে যতখানি প্রাধান্য দিয়েছেন চিত্রকে ততখানি নয়। 'ঘুমের মতো মেয়েগুলি'—এটা চোখে দেখার চেয়ে উপলব্ধির গাঢ়তার পরিচয়বহ। কিংবা আরো উপমা,

আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে
বসন্তের বাতাসটুকুর মতো।
বা, পূরবী রাগিনীগুলি দূর হতে চলে আসে
ছুঁতে তারে হয় নাকো ভরসা।
কাছে কাছে ফিরে ফিরে মুখপানে চায় তারা
যেন তারা মধুময়ী দুরাশা

কোথাও চাক্ষষ অভিজ্ঞতার পরিচয় নেই, অনুভূতির জগত স্পর্শ জগতে পরিণত প্রথম উপমাটিতে, দ্বিতীয়াটিতে কোন ইন্দ্রিয় নির্ভরতা নয় ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতির সিগ্ধ প্রকাশময়তা কল্পনা সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। শুধু চিত্রকে মুখ্যস্থান দিয়ে এমন এমন একটি উপমার কথা আমরা বলতে পারি যার তুলনা ছবি ও গানে আর একটিও নেই। স্তব্ধ বাদুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা/দলে দলে অন্ধকার ঘুমায় মুদিয়া পাখা[৯]—এই উপমাটি প্রতীতি জন্মাচ্ছে যেন অন্ধকারের ও দেহ আছে, হাত-পা-ডানা আছে, গাছের শাখা জড়িয়ে ধরবার বাদুড়ী কার্যকলাপও আছে। ব্যক্তিত্ব চেতনার (personification) সঞ্চারের চেয়েও 'নিশীথ-চেতনার' এমন গভীর আবহ উপমাটিতে আছে যে আমরা বিস্মিত হই দৃশ্য বর্ণনার কতখানি সমৃদ্ধ কল্পনার প্রকাশ তা। লক্ষ্য করবার বিষয়, এইসব উপমায় রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব ধারাটি আস্তে আস্তে খুঁজে নিচ্ছেন, এখন থেকে জড় অজড়ের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের সীমা স্বরূপ নির্নীত হচ্ছে।

কড়ি ও কোমলে বৃহত্তর স্থষ্টিপ্রবণ কবিমন। কবি বলেছেন, 'এই আমার প্রথম বই যার মধ্যে বিষয়ের বৈচিত্র এবং বহির্দৃষ্টি প্রবণতা দেখা দিয়েছে।'[১০] মানব জীবনের বিচিত্র লীলারহস্যের জগতে প্রবেশ করবার আকাঙ্খা কড়ি ও কোমলে স্বরূপায়িত। জীবন সম্বন্ধে কবির কিছু নতুন অনুভূতি নতুন অভিজ্ঞতা জন্ম নিল এ সময়ে। মায়ের মৃত্যুর পর অল্প বয়সের বালক রবীন্দ্রনাথ মেজবৌদি কাদম্বরী দেবীর স্নেহ-চ্ছায়ার আশ্রয় পেয়েছিলেন। কাদম্বরী দেবী নিঃসন্তান, বয়সেও রবীন্দ্রনাথের সমপর্যায়ের। বৌদির সাথে কবির সম্পর্ক গভীর বন্ধুত্বের, গাঢ় প্রীতির। প্রথম কাব্যজীবনে রবীন্দ্রনাথ কত ভাবেই না তাঁর কাছ থেকে উৎসাহ ও সহানুভূতি পেয়েছেন। এই কাদম্বরী দেবী হঠাৎ আত্মহত্যা করলেন, রবীন্দ্রনাথের বিয়ের ঠিক কিছুদিন পরে। শোনা যায় পারিবারিক মনোমালিন্যই এর কারণ। হয়তো এও হতে পারে রবীন্দ্রনাথের সাথে তাঁর সম্পর্কের এমন একটা ঘণগূঢ় আবেদন ও স্পর্শকাতরতা ছিল যা রবীন্দ্রনাথের বিয়ের পর তাঁকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য করেছিল। সে যা-ই হোক, এ মৃত্যু কবির কাছে প্রচণ্ড শোকের আঘাত নিয়ে এলো। রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি নিরাসক্ত, 'তাঁর মতে ভুলিবার শক্তি প্রাণশক্তির একটি প্রধান অঙ্গ', কিন্তু কাদম্বরী দেবীর মৃত্যু তাঁকে কিছু 'ভুলিবার শক্তি' দেয়নি। সমসাময়িক কালে কাদম্বরী দেবীর উদ্দেশ্যে তাঁর কিছু কাব্য উৎসর্গীকৃত হয়েছিল, পরবর্তী জীবনেও তাঁকে স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ কত কবিতা আর গানই না রচনা

করেছেন। এ মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে কবি 'জীবন স্মৃতি'তে লিখেছেন ;

> চারিদিকে গাছপালা মাটি জল চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তেমনি সত্যের মতই বিরাজ করিতেছে, অথচ তাহাদেরই মাঝখানে তাহাদেরই মত যাহা নিশ্চিত সত্য ছিল, এমনকি, দেহ প্রাণ হৃদয় মনের সহস্রবিধ স্পর্শের দ্বারা যাহাকে তাহাদের সকলের চেয়েই বেশি সত্য করিয়াই অনুভব করিতাম সেই নিকটের মানুষ যখন এত সহজে এক নিমেষে স্বপ্নের মতো মিলাইয়া গেল তখন সমস্ত জগতের দিকে চাহিয়া মনে হইতে লাগিল, এ কী অদ্ভুত আত্ম-খণ্ডন। যাহা আছে এবং রহিল না, এই উভয়ের মধ্যে কোন মিল করিব কেমন করিয়া।[১১]

কড়ি ও কোমলে এই মৃত্যু চেতনার প্রকাশ, জীবনের পথে মৃত্যুকে উপলব্ধি করবার বিলীয়মান অবসাদগ্রস্ততা লক্ষণীয়। উপমাগুলিই তার পরিচয় দেবে,—

১. স্মরণের চিহ্ন যত ছিল পড়ে দিন কত
ঝরে পড়া পাতার মতন। [পুরাতন

২. দিবসের শেষ পলে নিমেষের তরে
দুজনের আঁখি পরে-সায়াহ্ন-আঁধার
আঁখির পাতার মতো অসুক মুদিয়া। [অস্তমান রবি

৩. যেন কোন অস্তাচলে সন্ধ্যা স্বপ্নময়
রবির ছবির মতো যেতেছি গড়ায়ে। [ক্লান্তি

৪. মানব জীবন যেন সকলি নিষ্ফল
বিশ্ব যেন চিত্রপট, আমি যেন আঁকা। [অক্ষমতা

কিন্তু এই মৃত্যুর উপলব্ধিই কড়ি ও কোমলের মূল ভাব নয়। বৈরাগ্য ছিল এটা ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যেও নিখিল জগত কবির কাছে জীবনের আহ্বান সঙ্গীত নিয়ে এসেছে। 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে' এ ভাবটি সকল মৃত্যুশোক ছাপিয়ে উঠেছে। কবি লিখেছেন,

বাড়ীর ছাদে একলা গভীর অন্ধকারে মৃত্যুরাজ্যের কোন একটা চূড়ার উপরকার একটা ধ্বজ পতাকা তাহার কালো পাথরের তোরণদ্বারের উপরে আঁকপাড়া কোন একটা অক্ষর কিংবা একটা চিহ্ন দেখিবার জন্য আমি যেন সমস্ত রাত্রিটার উপর অন্ধের মতো দুই হাত বুলাইয়া ফিরিতাম। আবার সকাল বেলায় যখন সেই বাহিরের পাতা বিছানার উপরে ভোরের আলো আসিয়া পড়িত তখন চোখ মেলিয়াই দেখিতাম, আমার মনের চারিদিকের আবরণ যেন স্বচ্ছ হইয়া আসিয়াছে; কুয়াশা কাটিয়া গেলে পৃথিবীর নদীগিরি অরণ্য যেমন ঝলমল করিয়া ওঠে, জীবনালোকের প্রসারিত ছবিখানি আমার চোখে তেমনি শিশির সিক্ত নবীন ও সুন্দর করিয়া দেখা দিয়াছে।[১২]

এই ভাবটাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন উপমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

১. তাই বুঝি হৃদয়ের বিস্মৃত বাসনা
জাগিছে নবীন হয়ে পল্লবের মতো। [গীতোচ্ছ্বাস

২. গোধূলির তীরে বসে কেঁদেছে যে জন
ফেলেছে আকাশে চেয়ে অশ্রুজল কত
তার অশ্রু পড়িবে কি হইয়া নতুন
নব প্রভাতের মাঝে শিশিরের মতো। [অস্তাচলের পরপারে

৩। শত গান উঠিতেছে তারি অন্বেষণে
পাখীর মতন ধার চরাচরময়। [শেষ কথা

কড়ি কোমলের অনেকগুলো সনেটে নারী সৌন্দর্যের উন্মুক্ত বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার মধ্যে প্রেমাবেগের তীব্রতা ও উষ্ণতা প্রকাশ পেয়েছে। শুধুমাত্র অপ্রত্যক্ষ সৌন্দর্য সন্ধানে কবি নিয়োজিত নন, প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যের আস্বাদনে কবিপ্রাণ শিহরিত হয়েছে বারবার। কবিহৃদয়ের তীব্রতার প্রকাশ কোন অংশেই অস্বাভাবিক নয়, কারণ সময়টা ছিল সে তীব্রতা উপলব্ধির ব্যাপারে প্রকৃষ্ট। যৌবনের এমন একটা স্বপ্নলব্ধ বোধ আছে যাতে রাঙা কামনার উত্তাপে সবকিছুকে কুক্ষিগত করার উদগ্র বাসনার সঞ্চার হয়। জীবনযৌবনে ভোগাকাঙ্খার সত্যতাকে, কামনা বাসনার

বাস্তবিকতাকে স্বীকার করতেই হয়। কড়ি ও কোমলের উপমাতে এই ভোগবাসনার পরিচয় পেতে আমাদের দেরি হয় না। অবশ্য কড়ি ও কোমলের আগে ছবি ও গানের 'রানুর প্রেম' কবিতায় কবির ভোগাকাঙ্খার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। সর্বগ্রাসী প্রেমক্ষুধা নিয়ে প্রেমাস্পদাকে নিজের করে নেওয়ার প্রবল বাসনা এ কবিতার মূল বক্তব্য। কবি তাই বলেন,

এ ঘোর পিপাসা যুগযুগান্তে মিটিবে কি কভু আর
বুকের ভিতরে ছুরির মতন
মনের মাঝারে বিষের মতন
রোগের মতন, শোকের মতন রব আমি অনিবার।

রানুর প্রেমে আবেগের-উত্তাপ বেশি, কড়ি ও কোমলে তা শৈল্পিক বোধবুদ্ধি সম্পন্ন। নিম্নের উপমাত্মক অংশগুলোই এর সাক্ষ্য দেবে,

১. আমার যৌবন স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো। [যৌবন স্বপ্ন

২. পরিপূর্ণ তনুখানি বিকচ কোমল
জীবনের যৌবনের লাবন্যের মেলা। [বিবসনা

৩. দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর চয়ন। [চুম্বন

৪. কোথা সেই হাসি প্রান্তর চুম্বন তৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর [মোহ

শুধু ভোগতৃষ্ণা নয়, উপমা চয়নের মধ্যে শৈল্পিক সৌন্দর্যর্চ্চার প্রাধান্য সূচিত। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলার আছে 'কড়ি ও কোমলের' প্রিয়া মিলনের আকাঙ্খায় দেহাকুতির আভাস থাকলেও এ কথা সত্যি, কবি আস্তে আস্তে ভোগ মোহজাল থেকে দূরে সরে আসছেন। ভোগের তীব্রতার মধ্যে ক্লান্তি ও ম্লানিমার ছায়া লক্ষ্য করছেন বলে বন্ধন মুক্তির প্রয়াস,—

দাও খুলে দাও সখি ঐ বাহুপাশ
চুম্বন মদিরা আর করায়োনা পান।
কুসুমের কারাগারে রুদ্ধ এ বাতাস
ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও বন্ধ এ পরাণ। [বন্দী

মোহাবিষ্ট প্রেমবিচ্যুত এই নবজাগ্রত দৃষ্টিভঙ্গি কবির রোমান্টিক মানসিকতার পরিচায়ক। "তাঁর, ভোগাকাঙ্খায়ও কতকটা রোমান্টিক, যৌনাকর্ষণ হইতে ভাবগত আকর্ষণই প্রবল। বিবসনা নারীর দেহে তিনি 'লাজহীন পবিত্রতা'র সন্ধান করিতেছেন, নারীর স্তন সুমেরুকে কবি 'দেবশিষ্য মানবের মাতৃভূমি' বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, দেহের সায়রের মধ্যে ডুব দিতে চাহেন হৃদয়কে স্পর্শ করিবার জন্য, তনুদেহের দিকে চাহিয়া কবির দৃষ্টি দূরে অতীত জীবনের স্মৃতির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়—দেহের জন্যই আকর্ষণ কোথাও উদগ্র হইয়া দেখা দেয় না, ভোগবাসনাও যেন সৌন্দর্য সৌরভের সঙ্গে মিশিয়া বাতাসে সঞ্চারিত হইয়া যায়, বস্তুর মধ্যে আবদ্ধ হতে চায় না।"[১৩] বিশেষের মধ্যে নির্বিশেষের সন্ধান লাভ রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যানুভূতির মূল কথা। পরবর্তী জীবনে মানসী সোনার তরী, চিত্রা প্রভৃতি কাব্যে কবির সৌন্দর্যচেতনার যে ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করি তা উপরোক্ত উপলব্ধিজাত।

কড়ি ও কোমল ও মানসীর রচনাকালের খুব একটা বড় ফাঁক নেই।[১৪] অথচ আত্মবোধের গভীরতায় মানসী অনেক বেশি বিস্তৃত ও পরিণত; কল্পনায় ও প্রকাশে। রূপরস মাধুরীতে আত্মলীন কবির হৃদয়াবেবেগ সঞ্জাত প্রেমানুভূতির স্বরূপ যেমন স্পষ্ট হয়েছে এ কাব্যে, তেমনি দেশীয় আচারবিচার সম্বন্ধে কবির ব্যক্তিগত অন্তর্লক্ষ্যের প্রকাশও ঘটেছে। অর্থাৎ কবির কর্ম ও চিন্তার সাথে সুকুমার অনুভূতির সংমিশ্রণও হয়েছে মানসী কাব্যে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও স্মরণীয় মানসী ভালোবাসার কাব্য, প্রেমের কাব্য। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের নির্বিশেষত্ব এখানে স্থায়ীরূপ সন্ধানী। পার্থিব কামনা লাঘব করে মহত্তম প্রসঙ্গে উপনীত হবার বিশেষ মানসগঠন মানসী কাব্যে একটা পরিপর্ণ রূপ নেবার জন্য সচেষ্ট। প্রেমের উন্মাদনা এখানে সংযত ও স্থির প্রকল্প, দৈহিক কামনা ছাড়িয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে অখণ্ড অনন্ত রূপের পথ সন্ধানী। ভোগের ক্ষনিকতার নির্যোক খসে গেলে কবির উপলব্ধি জাগে 'বাহুলতা শুধু বন্ধন পাশ,' সে জন্যে

আনিয়াছি ছুরি তীক্ষ্ণ দীপ্ত প্রভাত-রশ্মি সম
লও, বিঁধে দাও বাসনা সঘন এ কালো নয়ন সম।
এ আঁখি আমার শরীরে তো নাই পুটেছে মর্মতলে—
নির্বাণহীন অঙ্গার সম নিশিদিন শুধু জ্বলে।
[সুরদাসের প্রার্থনা

রূপ সুধামুগ্ধ আঁখির নির্বাণহীন জ্বালাযন্ত্রণার শিকার হবেন না আর কবি।
বাসনা মলিন আঁখি কলঙ্ক ছায়া ফেলিবে না তায়
আঁধার হৃদয় নীল-উৎপল চিরদিন রবে পায়। [ঐ

লক্ষ্য করবার বিষয় উদ্ধৃত অংশগুলোতে বক্তব্য বিষয়ের পরিস্ফুটনের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সব উপমা সৃষ্টি করেছেন সেগুলি গতানুগতিক হলেও বিষয়কে আলোকিত করবার পক্ষে যথেষ্ট। কড়ি ও কোমল ও মানসী কাব্যে প্রেম চেতনার রূপলক্ষণ বেশ কয়েকটি রূপক অলঙ্কারে বিধৃত হয়েছে, যেমন—হৃদয়-আসন, হৃদয়-আকাশ, কল্পনা-মধুপ, চুম্বন-মদিরা, বাসনা-নিশ্বাস, যামিনী-নাগিনী, মরণ-বন্ধন, মিলন-দাবানল, আকাঙ্খা পারাবার, প্রাণ হুতাশন, বাসনা-ছুরি, বাসনাবহ্নি, চাহনি-ছুরি, বিরহের চর, সংগীতের কুসুম, স্বপনের জাল, সৌরভের বেড়া, পরশের ফাঁদ, সংশয়ডোর, প্রেমের কারাগার ইত্যাদি। এই সব ঘনীভূত উপমাত্মক শব্দগুচ্ছ রোমান্টিক গীতিচেতনার প্রকাশও ঘটিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যে বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক উপমাশিল্পী তার প্রমাণ দেয় এই 'মানসী' কাব্য। এখানে রবীন্দ্রনাথ যেমন কবিতার ভাষা ও ছন্দকে খুঁজে পেয়েছেন, তেমনি উপমার ভাষাকে ও আয়ত্তাধীন করেছেন। উপমায় সহজ চিত্রের স্পষ্ট প্রাধান্য আছে, কিন্তু সর্বত্রই তা কল্পনা সমৃদ্ধির পরিচায়ক। দিন শেষ হয়ে আসছে, অন্ধকার-যবনিকা চারদিক ছেয়ে ফেলছে, দিগন্তে নিবিড় ঘন বনরেখা করিব কাছে মনে হচ্ছে,

নিদ্রালস আঁখির পরে
ভুরুর মতো কালো। [অপেক্ষা

কবির মানসীও সে বিজন পরিবেশে যুথির হারে পরিসজ্জিত হয়ে ঘুরে বেড়াবে 'গন্ধটুকু অন্ধকারে রেখার মতো রাখি'[১৪] নদীর কালো জল বইবে ছলভরা সুগভীর

চুরির মতন'[১৫]। এ সব উপমার ভাষা আছে, শুধু বক্তব্য শেষ করে এদের কাজ ফুরোয় না। গানের রেশের মতো একটা সম্মোহন সমাপ্তি সৃষ্টি করে। লক্ষনীয় এ জাতীয় উপমা ইন্দ্রিয়চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ, আর অভিজ্ঞতাকে সংহত করবার প্রয়োজনেই যেন এ সব উপমা সৃষ্টি। এ জন্য বলা চলে, মানসীতেই রবীন্দ্রনাথ উপমাধারাকে খুঁজে পেয়েছেন। পরবর্তীকালে তাঁর উপমা সৃষ্টিতে প্রচুর বৈচিত্র্য আছে এ কথা স্বীকার্য এবং এর বিকাশধর্ম মানসী থেকেই শুরু। মানসী-পূর্বতন উপমাগুলি শুধু বিষয়ানুসারী, মানসীতে উপমা বিষয়ানুসারী তো বটেই সাথে সাথে কাব্যিক ব্যঞ্জনার রেখানুসারীও।

সোনার তরী থেকে ক্ষণিকা

সোনার তরী থেকে কবি প্রতিভার জয়যাত্রা শুরু। এ কাব্যে রবীন্দ্র মানসের ত্রয়ী প্রবণতার সম্মিলন ঘটেছে, সে ত্রয়ী প্রবণতা তাঁর প্রেমবোধ, সৌন্দর্যচেতনা এবং বিশ্বানুভূতি। গভীর ভাবে বিশ্লেষন করলে দেখা যাবে সোনার তরী কাব্যে এই ত্রয়ী প্রবণতার আলাদা আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই, সবগুলোই সংশ্লিষ্ট, একে অপরের নির্ভরশীল। এই কাব্যে মানুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির একাত্মতা বোধ জেগেছে, জীবন ও জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বস্তুও তাঁর কাছে গূঢ় প্রাণপ্রবাহের ইংগিত নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে এবং তাঁর প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনার বিকাশ ঘটিয়েছে। কিন্তু এই প্রেম ও সৌন্দর্যবোধ মানসী কাব্যের মতো বস্তুজগতে সমাকীর্ণ থাকেনি, বিশ্বের বৃহত্তম পটভূমিকায় বিন্যস্ত হয়েছে। বস্তু জগতের খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য অখণ্ড রূপে প্রকাশ পেয়েছে সোনার তরীতে এবং চিত্রাতেও বটে। "সোনার তরী ও চিত্রা কাব্যেই তাহার জীবন নিজের মনের বস্তুহীন কল্পনার মধ্য হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বস্তুময় বৃহত্তর জীবনের মধ্যে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের দৈনন্দিন জীবনের রূপও এক নূতন সৌন্দর্যময় আনন্দ রূপে কবির চোখে ধরা পড়িল, শিক্ষা ও অভিজ্ঞাতলব্ধ জ্ঞান সবল কল্পনা ও গভীরতর ভাবরহস্যে সমৃদ্ধি লাভ করিল। বাক্য, পদ ও শব্দ ভাবব্যঞ্জনায় অনির্বচনীয় হইয়া উঠিল; ব্যঞ্জনা ও ধ্বনির মূল্য যেন কবি এই প্রথম আবিষ্কার করিলেন।" [১৬]

মানসীর মধ্যে প্রেম ও সৌন্দর্যের দেহোত্তীর্ণতার যে নির্বিশেষত্ব পেয়েছি সোনার তরীতে তা আরো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মানসপ্রিয়া এখানে ভাবগতরূপে পর্যবসিত।[১৭] কবি তাকে উপমার পর উপমা দিয়ে সাজিয়েছে। এই মানসীকে কবি এক সময়ের

'খেলার সংগিনী' হিসেবে কল্পনা করেছেন, এখন সে কবির জীবনের মূলে 'অধিষ্ঠাত্রী দেবী' রূপে 'মহিষীর মতো' প্রতিষ্ঠিতা। সে তাঁর জীবনের 'প্রথম প্রেয়সী' 'ভাগ্য গগনের সৌন্দর্যের শশী' মুখ তার 'নবস্ফুট পুষ্পসম' 'বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম' স্নিগ্ধদৃষ্টি সুগম্ভীর স্বচ্ছ নীলাম্বরসম' 'হাসিখানি স্থির অশ্রু শিশিরেতে ধৌত' কলস্বর 'নির্ঝরের মতো, এবং 'পরিপূর্ণ দেহ মঞ্জরিত বল্লরীর মতো'। মানসপ্রিয়ার এই যে উপমাত্মক বর্ণনা, আতিশয্যে উচ্চকিত নয়, বরং স্নিগ্ধ অনুভব সঞ্জাত প্রশান্ত ভাববস্তুরূপের স্বাভাবিক প্রকাশ। চিত্রা কাব্যের চিত্রা কবিতায় মানসসুন্দরীর উদ্দেশ্যে কবি যখন বলেন,

অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী
তুমি অন্তর ব্যাপিনী।
একটি স্বপ্ন মুগ্ধ সজল নয়নে
একটি পদ্ম হৃদয়বৃন্ত শয়নে,
একটি চন্দ্র অসীম চিত্ত গগনে
চারিদিকে চিরযামিনী।

তখন মানস সুন্দরীর একধিক উপমান, স্বপ্ন পদ্ম, চন্দ্র ; কবির সৌন্দর্যচেতনার শব্দপ্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং এ সব উপমানই প্রতীতি জন্মায় কবির উপলব্ধি কতখানি দেহাধারবিচ্যুত। ঠিক একই উপলব্ধি থেকে 'সুরেন্দ্রবন্দিতা' নর্তকী উর্বশী তাঁর কাছে 'উষার উদয় সম অনবগুণ্ঠিতা' বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনা আপনিই বিকশিত। বিজয়িনীর অনাবৃত্ত সৌন্দর্যবর্ণনাও উপমাকে আশ্রয় করে সার্থক হয়েছে,

ঘিরি তার চারিপাশ
নিখিল বাতাস আর অনন্ত আকাশ
যেন এক ঠাঁই এসে সাগ্রহে সন্নত
সর্বাঙ্গ চুম্বিল তার সেবকের মতো
সিক্ত তনু মুছি দিল আতপ্ত অঞ্চলে
সযতনে ; ছায়াখানি রক্ত পদতলে
চ্যুত বসনের মতো রহিল পড়িয়া।

বর্ণনার এই নিষ্কলঙ্ক রূপাভিজ্ঞান সৌন্দর্যচেতনার সুস্থির সংযত প্রকাশ। কোথাও আবেগের তীব্রতা নেই, উন্মাদনার বিশৃঙ্খলা নেই, আছে শুধু উপলব্ধির সুশৃঙ্খল বিন্যাস।

সোনার তরী পর্বে কবি প্রকৃতির প্রতি পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়েছেন। প্রকৃতির তরুলতা গাছপালা, নদীনালা, আকাশ, মাটি বালুচর সবকিছুই রূপরস গন্ধের স্পর্শ কবিপ্রাণে সঞ্চারিত হয়েছে। অনাবিল সৌন্দর্যানুভূতি নিয়ে কবি এগুলোর সাথে একাত্মতা অনুভব করছেন, এ একাত্মতা কবিপ্রানে নতুন সত্যবস্তুর স্বরূপে প্রকাশিত। কবির ভাষায় বলা যায়,

> ঐ যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি। ওর এই গাছপালা নদী-মাঠ কোলাহল-নিস্তব্ধতা প্রভাত-সন্ধ্যা সমস্ত-সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন কি কোন স্বর্গ থেকে পেতুম।[১৮]

এই নিবিড় প্রকৃতিচেতনার পশ্চাৎপট বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই রবীন্দ্রনাথকে এই সময় জমিদারী বিষয় কর্ম উপলক্ষ্যে উত্তর ও মধ্যবঙ্গে এবং কিছুদিন উড়িষ্যায় কাটাতে হয়েছিল। মানসীর কিছু কিছু কবিতা গাজীপুরে রচিত।[১৯] প্রকৃতিকে কাছে থেকে দেখার সুবিধাটুকু কবি যথাসম্ভব ব্যবহার করেছেন এই কাব্যে। কিন্তু সোনারতরী পর্বে প্রকৃতিকে যতখানি নিকট থেকে তিনি দেখেছেন এর আগে কখনো এমন সুযোগ পাননি। বেশির ভাগ সময় কেটেছিল পদ্মানদী ও এর শাখানদীগুলোর উপরে বোটবাস যাপনের মাধ্যমে। নদীর দুপাশের জনপদগুলো শ্যামল বনানীর পটভূমিকায় কবিচিত্তে নিবিড় রস প্রেরণা যুগিয়েছে। শুধু প্রকৃতি নয়, মানুষের সঙ্গে কবির পরিচয় গভীর হলো এ পর্বে। শুধু সোনারতরী নয়, এ সময়েরই লেখা চিত্রা, চৈতালি কাব্য কয়েকটি উৎকৃষ্ট ছোট গল্প।[২০] রবীন্দ্র কবিপ্রকৃতি এখানে সংযত সংহত হয়েছে, আবেগ ও মননের সংমিশ্রণ ঘটেছে বলতে হবে। এই কারণেই উপমা ব্যবহারে কোন কৃত্রিমতা পরিলক্ষিত নয়, উপমা এখানে কাব্যকলারই অঙ্গীভূত। উপমার ঔচিত্যবোধও স্বাভাবিক এবং কাব্যধারানুসারী। মানস-সুন্দরীর পদ্মা বর্ণনা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে,

> হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
> শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
> প্রসারিয়া তনুখানি সায়াহ্ন আলোকে
> শুয়ে আছে।

বিকেলের ভরা পদ্মাকে 'শ্রান্ত-রূপসী' রূপে প্রতীয়মান করা শুধু উপমেয় উপমানের আনুপাতিক সম্বন্ধের যথার্থতা প্রতিপন্ন করে না, সম্পূর্ণ চিত্রকে প্রোজ্জ্বল করে। কিন্তু বর্ণনা আরো কত উপমাত্মক হতে পারে, তার প্রমাণ দেবে নিম্নের অংশটুকু—

আজি মেঘমুক্ত দিন ; প্রসন্ন আকাশ
হাসিছে বন্ধুর মতো, সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে ; ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে, অর্ধমগ্ন বালুচর
দূরে আছে পড়ি, যেন দীর্ঘ জলচর
রৌদ্র পোহাইছে শুয়ে। ভাঙা উচ্চতীর
ঘনচ্ছায়াপূর্ণ তরু ; প্রচ্ছন্ন কুটীর ;
বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্য ক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো। [সুখ ঃ চিত্রা

উদ্ধৃতির চারটি উপমার মধ্যে দুটিকে আমরা চমৎকার বলবো। নদীবক্ষে অর্ধমগ্ন বালুচরকে জলচর রূপে কল্পনা করা চিত্রল কবিমানসের স্বরূপ স্পষ্ট করেছে। শেষ উপমাটিতে চিত্রধর্ম আরো প্রখর ও শানিত। কবিকল্পনায় গ্রামের বঙ্কিম পায়ে চলার পথ যখন তৃষ্ণার্ত জিহ্বার মতো পিপাসার গভীর আকুতি নিয়ে নদীস্রোতে মিশেছে তখন এই সত্য স্পষ্ট হয় যে উপমেয় কতখানি আলোকিত হয়েছে উপমানের দ্বারা। স্মর্তব্য, রবীন্দ্র কবিমানস চিত্রধর্মকে প্রথম অঙ্গীকৃত করেছে ছবি ও গানে। কিন্তু এ কথা সত্যি উপমায় চিত্র ধর্মের সার্থক রূপায়ন ঘটেছে সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি প্রভৃতি কাব্যে। ছবি ও গানে কবিতা কথাচিত্র প্রধান, সেই কারণে উপমা সহজ সরল. এক কথায় অতিসাধারণ। কিন্তু উপরোক্ত উপমা দুটিতে চিত্র প্রধান সন্দেহ নেই, কিন্তু সে চিত্র কল্পনার তির্যকতায় কিছুটা জটিল, অভিজ্ঞতার পরিধিতে কিছুটা পরিশীলিত চিন্তাযুক্ত। এই পর্বে প্রকৃতি ও মানুষের সাথে করিব পরিচয় নিবিড়তর হয়েছে। যে উপমা ব্যবহার করা হয়েছে তা শুধু উপলব্ধির গভীরতার পরিচায়ক নয়, সে পরিচয়টুকু

ধরে রাখবার পক্ষেও যথেষ্ট। আরো উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হচ্ছে ও পর্বের উপমাগুলো বাঙলার প্রাকৃতিক দৃশ্য নির্ভর, কখনো জনপদের জীবন চিত্রণ সম্পৃক্ত সে দৃশ্য, কখনো নদী-মাঠ-বনের চিত্রসম্বলিত। রবীন্দ্রনাথের কবিতার দৃশ্যপট বাঙলার জনপদ, বাঙলার প্রকৃতি, এক কথায় বাঙলা দেশ ; এ পর্বের কাব্যগুলিতে উপমাও সে হিসেবে দেশীয় দৃশ্যপট নির্ভর। উপরোক্ত দুটি উপমা এই কারণে উল্লেখযোগ্য। চৈতালি থেকেও উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে বাঙলার দৃশ্য পটের পরিচয় পাবার জন্যে,

চলেছে তরনী শান্ত বায়ুভরে।
প্রভাতের শুভ্র মেঘ দিগন্ত শিয়রে।
বরষার ভরা নদী তৃপ্ত শিশুপ্রায়
নিস্তরঙ্গ পুষ্ট অঙ্গ নিঃশব্দে ঘুমায়।
দুই কূলে ক্ষেত্র শ্যামশস্যে ভরা,
আলস্য মন্থর যেন পূর্ণ গর্ভা ধরা [নদী যাত্রা

কানায় কানায় জলপূর্ণ নিস্তরঙ্গ নদী, শান্তবায়ুতে নৌকা নদীর উপরে বয়ে চলেছে, দুপাশে ফসল ভরা মাঠ ;—বাঙলার স্বাভাবিক একটি চিত্র এটি। কিন্তু যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ হয়েছে উপমার জন্যে। যে শিশু খাবার পায় না সে কাঁদে, হাত পা ছোঁড়ে, খাবার পেলেই তৃপ্ত হয়, আপন মনে খেলা করে এবং কখন নিঃশব্দে ঘুমিয়ে পড়ে। বর্ষাকালের নদীও তেমনি জলে পূর্ণ হয়ে খরতীব্র স্রোতাবেগের বিক্ষুব্ধতার অবসান ঘটিয়েছে, খাবার পাওয়া শিশুর মতো নদীরও তৃপ্তি হয়েছে যেন। 'আলস্যমন্থর' আর 'পূর্ণগর্ভা' বিশেষণ দুটি নদীর উভয় কূলের পরিপূর্ণ ফসলভারে ইষৎ অবনতা শস্যক্ষেত্রের যথার্থ চিত্র সৃষ্টি করেছে।

বিশ্ব প্রকৃতির প্রতি আজন্ম সূত্রে কবি যে নিবিড় সম্পর্ক অনুভব করেন তা ব্যক্ত হয়েছে 'সোনার তরী'র 'যেতে নাহি দেব', 'সমুদ্রের প্রতি', 'বসুন্ধরা' প্রভৃতি কবিতায়। এ সম্পর্কের ভিত্তিতে কবির বৃহত্তর প্রকৃতি চেতনার পরিচয় সুস্পষ্ট। পৃথিবীর প্রত্যেক 'ঘাসে ঘাসে শিরায় শিরায়' সম্পর্ক সূত্র স্থাপনের মানসিকতাকে হয়তো বা নাম দেওয়া যেতে পারে 'বিশ্বানুভূতি', শুধু বোঝাবার জন্যে। কিন্তু ঘন-আত্মীয় বৎসলতার সংগূঢ় অন্তরঙ্গতায় সে নাম-প্রক্রিয়ার মহাত্ম্য অবলুপ্ত হয়ে গেছে,

শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে

যাহা পায় তাইসে হারায়, তবু তোরে
শিথিল হলো না মুষ্টি। [যেতে নাহি দেবো

কিংবা,

ইচ্ছা করিয়াছে
সকলে আঁকড়ে ধরি এ বক্ষের কাছে
সমুদ্র মেখলা পরা তব কাটিদেশ,
প্রভাত রৌদ্রের মত অনন্ত অশেষ
ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে— [বসুন্ধরা

'সমুদ্র-মেখলা পরা তব কাটিদেশ' কালিদাসীয় চিত্রধর্মী উপমার প্রকৃষ্ট নিদর্শন হতে পারে, কিন্তু রাবীন্দ্রিক উপমার মূল প্রেরণা 'প্রভাতরৌদ্রের মতো' চারিদিকে ব্যাপ্ত হয়ে যাওয়ার ভাবসম্মত। কিন্তু উপমা হিসেবে এটি সাধারণ, অথচ বিশ্ব সম্পর্কের নিবিড়তাকে ধরে রাখতে তৎপর।

কল্পনা কাব্যে কবির অতীত চেতনার প্রকাশ হয়েছে। অবশ্য চৈতালির কিছু কবিতাতে প্রাচীন ভারতীয় জীবন কথার পরিচয় আছে কল্পনাতে সেই অতীত জীবনের সৌন্দর্য ধ্যানে নিজেকে মোহমুগ্ধ রেখেছেন। লক্ষনীয় যে অতীতচারী চেতনার মধ্যে আবেগ তীব্রতার কোন উন্মাদনা নেই, আছে উপলব্ধির নিবিড়তায় রূপচর্চার প্রশান্ত মহিমা। এই করণে কল্পনা কাব্যের ভাষা স্থির আলঙ্কারিক রীতিসম্পন্ন। 'স্বপ্ন', 'বর্ষামঙ্গল', 'মদন ভস্মের পূর্বে' ও 'মদন ভস্মের পরে' কবিতায় ভাষা, ছন্দ ও প্রকাশ ভঙ্গির যে প্রসাধন কলা রয়েছে তার মূলে আছে আবেগের সংযত প্রশান্তি। প্রথম নাথ বিশী বলেন, 'কল্পনার অভিজ্ঞতা সেই অতীত জীবনের স্রোতশ্চ্যুত বদ্ধ জলাশয়, স্থিতি ইহার বিশেষত্ব, গতি নহে।" এই জাতীয় অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে গেলে ভাষা, ছন্দ ও বাগ-ভঙ্গীর কারুসুললিত প্রসাধনকলার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া উপাই নাই"।[২১] 'বর্ষামঙ্গল' কবিতার একটি অংশ থেকে 'কল্পনার' ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাষার নমুনা দেওয়া যেতে পারে,

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যাম গম্ভীর সরসা।

ছন্দ-ধ্বনি ও শব্দ-বিন্যাসের সামঞ্জস্যে কবিতাটি উপভোগ্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু এ অংশটুকু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রযুক্ত বিশেষিত শব্দগুলো উপমারই কাজ করেছে। বরষাকে 'নবযৌবন' আর 'শ্যাম গম্ভীর সরসা' বলাতে যত না কল্পনার সমৃদ্ধি ঘটানো হয়েছে তার চেয়ে বরষার আগমনের কার্যপ্রণালীটুকু বৃষ্টিজল বিধৌত পৃথিবীর সিক্ত সৌরভযুক্ত বিলাসে আমোদিত হয়েছে। সেই অতীতচেতনাকে বিচিত্র অভিজ্ঞতায় উপমা অভিজ্ঞানের মধ্যে খুঁজে পেতে দেরী হয় না। 'স্বপ্ন' কবিতার পটভূমি কালিদাসের উজ্জয়িনী, প্রাচীন ভারতের চিররহস্যময় এক পৌর নগরী। স্বপ্নালোকে বিচরণরত কবি 'উজ্জয়িনীপুরে' পূর্বজন্মের প্রথমা প্রিয়া মালবিকার সান্নিধ্য কামনা করেন। অনাগত প্রত্যাশা শেষে মালবিকার দেখা তিনি পেয়েছেন,

হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
সন্ধ্যাকালে দ্বার প্রান্তে সোপানের পরে
সন্ধ্যার লক্ষীর মতো, সন্ধ্যাতারা করে।
অঙ্গের কুঙ্কুম গন্ধ কেশধূপ বাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।

স্বপ্নের মধ্যেও বাস্তবের সৌন্দর্যপিপাসা কোথাও ম্লান হয়নি। তাই বুঝি অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ আর কেশসৌরভ কবির সর্বাঙ্গে উতলা নিশ্বাস ফেলে। কিন্তু অতীত স্মৃতি সঞ্চয়ী প্রেম চেতনা বাস্তবের রূঢ়তায় কোথায় হারিয়ে যায়। যে প্রিয়া 'কুলায় প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখীর মতো' কবিতে আশ্রয় খোঁজে সেও যেন হারিয়ে যায়, স্বপ্নের অবসান ঘটে। এ বেদনাটুকু শুধু স্বপ্ন কবিতাতে নয়, কল্পনার অতীত স্মৃতি নির্ভর সব কবিতাগুলোতে মূর্ত হয়েছে। সেদিক থেকে কল্পনার উপমা সৃষ্টিতে উপলব্ধির নিবিড় প্রশান্তি ও স্নিগ্ধ হৃদয়াবেগের প্রকাশ লক্ষনীয়। যেমন,

১. আমার মধুর অধর,
নব লাজসম রক্ত
হে আমার চিরভক্ত
একি সত্য। [প্রণয় প্রশ্ন

২. তুমি সন্ধ্যার মেঘ শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা। [মানস প্রতিমা

৩. ক্লান্তিটানে অঙ্গময় প্রিয়ার মিনতি সম [অশেষ

'কল্পনা' কাব্যে অতীত অভিজ্ঞতাসম্পৃক্ত কবিতাগুলো ছাড়া আরো এক ধরণের কবিতা আছে। 'কল্পনার কবিতার রকম-প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সে গুলি হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাঙ্খার আবেগ, কিম্বা রূপ রচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার একজাতের কবিতা আছে যা মুক্তদ্বার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে।[২২]

দ্বিতীয় জাতের কবিতাগুলো হচ্ছে 'দুঃসময়', 'বর্ষশেষ', প্রভৃতি। দুঃসময়ে সময় পুরুষের দ্বিধা দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধতার প্রকাশ ঘটেছে এবং তা বোঝানো হয়েছে উপমা দিয়ে,

এ নহে মুখর বনমর্মর গুঞ্জিত
এ যে অজাগর গরজে সাগর ফুলিছে
এ নহে কুঞ্জ কুন্দকুসুম রঞ্জিত
ফেন হিল্লোলে কল কল্লোলে দুলিছে।

'বর্ষশেষ' কবিতা শেলীর 'Ode to the west wind' এর অনুপ্রেরনাজাত এ কথা তথ্য হিসেবে মনে রাখা যেতে পারে, কিন্তু এ কবিতার ধ্বনি সম্পদ ও চিত্ররূপ এত বেশী যে এ কবিতাকে রবীন্দ্র কবি প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে। ইশানের পুঞ্জমেঘে কাল বৈশাখীর নিগূঢ় প্রকাশ নতুন জীবনচেতনার সংকেত হয়ে কবি কল্পনায় ধরা দিয়েছে। এ কবিতার বাক প্রতিমায় ঐশ্বর্যময়তা সহজেই লক্ষনীয়। ভাব যেমন সকল জীর্ণতাকে অপসারণ করে নব জীবনের উল্লাসময়তায় প্রদীপ্ত, ভাষাও তেমনি তীব্র আবেগের গতিবেগ সম্পন্ন। আমরা শুধু উপমার অংশটুকু তুলে দিচ্ছি কবিতার ভাববস্তুর সমর্থনে।

অতীত জঞ্জালের অপসারণ ঃ

ধূলিসম তৃণসম পুরাতন বৎসরের যত
নিষ্ফল সঞ্চয়।

সম্মুখপানে এগিয়ে যাবার প্রেরণা ঃ

১. শঙ্খের মতন তুলি একটি ফুৎকার হানি দাও
হৃদয়ের মুখে।

২. ধাও গান, প্রাণভরা ঝড়ের মতন উর্ধ্বশ্বাসে
অনন্ত আকাশে।

৩. শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুণ্ড হতে।

নতুন জীবনের ইঙ্গিত ঃ

১. উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপরেন
জলদর্চিরেখা

২. রথচক্র ঘর্ঘরিয়া এসেছ বিজয়ী রাজ সম
গর্বিত নির্ভয়।

৩. শুধু তাহা সত্য স্নান ঋজু শুভ্র মুক্তজীবনের
জয়ধ্বনিময়।

চৈত্রের পরেই বৈশাখে নববর্ষ। 'ভৈরব,' 'রুদ্র', 'তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু' বৈশাখ 'ধূলায় ধুসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল' নিয়ে সুগম্ভীর মহাজীবনের আহ্বান জানায়। বর্ষশেষের পর বর্ষশুরুতে নতুন জীবনবোধের উপলব্ধি জাগ্রত।

ক্ষণিকার ভাব ভাষা ও ছন্দে যে চটুলতা ও সহজ সরসতা লক্ষ্য করা যায় তা কবির তাৎক্ষণিক জীবনোপলব্ধির স্বাক্ষর। "ক্ষণিকায়' ক্ষণিক কালের জন্য কবি সহজ সাধনার পথে নামিয়াছেন।"[২৩] প্রেম, সৌন্দর্য ও বিশ্বানুভূতির যে জটিল তাত্ত্বিক সাধনার পথে কবি নিমগ্ন ছিলেন এতদিন, তা একটা কঠিন জড়বস্তুর মতো বর্তমান জীবনের সুখদুঃখ আশা-নৈরাশ্য বিরহ মিলনপূর্ণ বৈচিত্র্যময় মূহূর্তগুলি উপভোগের ব্যাপারে বাধা জানিয়েছে। 'ক্ষণিকা' এদিক থেকে আত্মোপলব্ধির কাব্য, সহজ সরল মাধুর্যে ক্ষণকালের আনন্দে আত্মলীন থাকবার প্রয়াস মুখর। এই ভাবটুকু ক্ষণিকার কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উপমার মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে। যেমন,

১. শুধু অকারণ পুলকে
নদী-জলে পড়া আলোর মতন
ছুটে যা ঝলকে ঝলকে। [উদ্‌বোধন

২. হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে। [নববর্ষা

৩. শত-বরণের ভবে-উচ্ছ্বাস
কলাপের মতো করিছে বিকাশ। [ঐ

৪. মন দেয়া নেয়া অনেক করেছি
মরেছি হাজার মরনে
নুপুরের মতো বেজেছি চরণে চরণে। [উদাসীন

লক্ষনীয়, উপমানগুলো,—আলো, ময়ূর, কলাপ, নুপুর ; কবিহৃদয়ের সরসতা, প্রফুল্লতা ও নৃত্যসচল চিত্তবৃত্তির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নৈবেদ্য হতে খেয়া

এই পর্বের উল্লেখযোগ্য তিনখানি কাব্য নৈবেদ্য, উৎসর্গ এবং খেয়াতে করিব অধ্যাত্ম চেতনার প্রকাশ ভাব-সাধনায় লীলায়িত, ক্ষণিকার ভাবপ্রকৃতির সাথে পার্থক্যও স্পষ্ট। বিশ্বদেবতাবোধের উপলব্ধি এসেছে এ পর্বে—গভীর ধর্মবোধ ও ভগবত সাধনার দ্বারা কবি তপোচারী তাপসের মতো সে উপলব্ধির গভীরতম রূপসন্ধানে নিয়োজিত। রবীন্দ্র কবি মানস উত্তরাধিকার সূত্রে[২৪] উপনিষদের ভাবদ্বারা অনুপ্রাণিত। উপনিষদে বিশ্বের 'খণ্ডতা বৈচিত্র্য ও বহুত্বের' মধ্যে যে সমাধিত সাধনার উল্লেখ আছে এ পর্বের কাব্যগুলোতে তা স্পষ্ট স্বরূপ নিয়েছে। স্মরণযোগ্য যে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম সাধনা প্রকৃতি ও মানুষ নিরপেক্ষ নয়—সমন্বিত সাধনার মূল্য তাহলে রইল কই? রবীন্দ্র কবিমানসে সীমা অসীমের ঘনীভূত সম্পর্ক একদিকে তাঁর অধ্যাত্মচেতনা অন্যদিকে বিশ্বজগত চেতনার[২৫] সমন্বয়। এই জন্য বলতে হয় নৈবেদ্য উৎসর্গ খেয়া ইত্যাদি কাব্যের মূলভাব বিশ্বদেবতার মহিমা, যদিও পূর্বোক্ত সমন্বয় সূত্রে

এই সব কাব্যে কখনো স্বদেশচেতনা[২৬], কখনো প্রকৃতিচেতনার প্রকাশ ঘটেছে। কবিভাষাও সেই বিশ্বদেবতাবোধের অমূর্ত ভাবকে ধারণ করেছে। ভাষা ভাবেরই প্রতিরূপ, কবিহৃদয়ের অস্ফুট ভাবরাশিকে স্ফুট করে তোলাই ভাষার কাজ। আর উপমা যেহেতু কবিভাষারই অন্তর্গত, সে জন্যে ভাব প্রকাশের মাধ্যমও বটে। নৈবেদ্য, উৎসর্গ এবং খেয়াতে উপমার অসাধারণত্ব তেমন কিছু নাই, কিন্তু নিবেদিত চিত্তের মর্মবাণীর প্রকাশক হয়ে উঠেছে উপমাগুলো এবং এগুলি বিশ্বদেবতাবোধের উপলব্ধি সম্মত,—

১. প্রদীপের মতো
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আলো তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে।
[৩০ নং কবিতা। নৈবেদ্য

২. যে অলস চিন্তালতা
প্রচুর পল্লবাকীর্ণ ঘন জটিলতা
হৃদয়ে বেষ্টিয়া ছিল, তারি শাখাজালে
তোমার চিন্তার ফুল আপনি ফুটালে
নিগূঢ় শিকড়ে তার বিন্দু বিন্দু সুধা
গোপনে সিফন করি। [৪নং কবিতা—
সংযোগ অংশ উৎসর্গ

৩. কুঁড়ির মতো কেটে গিয়ে
ফুলের মতো উঠলো কেঁদে
সুধা কোষের সুগন্ধ তার
পারলে না আর রাখতে বেঁধে।
ওরে মন, খুলে দে মন,
যা আর তোর খুলে দে—
অন্তরে যে ডুবে আছে
আলোক পানে তুলে দে।
[বিকাশ ঃ খেয়া

গীতালি, গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য ইত্যাদি সংগীত কাব্যগুলোতে বিশ্বদেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদনের ভাব ব্যক্ত হয়েছে। কাব্যগুলো খেয়ার প্রায় সমকালেই লেখা। সংগীতের কুসুমে ভক্তিসাধনার মালা গাঁথার আকুলতা সার্থক হয়েছে কাব্যগুলোতে। এ উপলব্ধি থেকে কবি বলেন,

চেতনা আমার কল্যাণ রস সরসে
শতদল সম ফুটিল পরস হরষে
সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।
[গীতাঞ্জলি

সেজন্যে,

ঘন শ্রাবণ মেঘের মতো
রসের ভারে নম্র নত
একটি নমস্কারে, প্রভু
একটি নমস্কারে
সমস্ত মন পড়িয়া থাক
তব ভবন দ্বারে। [ঐ

যেন উপমাটির ভিতরে নিবেদনের চরম আকুলতাই ব্যক্ত হয়েছে। জলপূর্ণ ঘণ শ্রাবণ মেঘ যে ভাবে বর্ষণ উন্মুখ থাকে, কবির মন ও যেন নিবেদনের সৌম্য ইচ্ছায় পরিপূর্ণ ও অবনত থাকে। নিবেদিত চিত্তে কোন বৈকল্য স্থান পায় বিধায় সম্ভবতঃ মৃত্যুর মতো একটা ভয়াবহ নিশ্ছিদ্র অনভূতি নতুন উপলব্ধির প্রতীতিতে সার্থকতা পায়। নৈবেদ্যে কবি মৃত্যু সম্বন্ধে যে উপমাটি ব্যবহার করেছেন তাতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্বন্ধীয় বিশেষ ধারণা পরিস্ফুট হয়েছে। মৃত্যু তাঁর কাছে,

স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে
মুহূর্তে অশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে। [মৃত্যু

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে 'স্তন' এখানে জন্ম মৃত্যু উভয়েরই প্রতীক। একই অর্থে বলা চলে মৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কাছে 'দ্বিতীয় জন্ম'। রবীন্দ্র মানসে জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য নাম

মাত্র, আসলে মহাজীবনেরই অন্তর্গত জীবন ও মৃত্যু। মরণ যেন জীবনের সমাপ্তি নয়, জীবনের পরিপূর্ণতা। গীতাঞ্জলির সেই কবিতা স্মরণ করা যেতে পারে,

ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, কও আমারে কথা।

মরণের কোন রূপাভিজ্ঞান নেই, তা' একটি কঠিন মহাসত্য। কিন্তু এই অমোঘ সত্যে গুণাগুণ সম্পন্নতার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুর বিশুদ্ধ ও নিষ্কলঙ্ক চেতনার প্রকাশ ঘটিয়াছিলেন একসময়,

সকল অভ্যাস-ছাড়া সর্ব্ব আবরণ হারা
সদ্য শিশুসম
নগ্নমূর্তি মরণের নিষ্কলঙ্ক চরণের
সম্মুখে প্রণম ॥ [মৃত্যুর পরে। চিত্রা

'মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' বলে 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে মরণের সাথে যে সখ্য তিনি পাতিয়েছেন তারই আশ্বাস থেকে 'প্রভাত সংগীতে' বলেছেন 'জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারই নাম'। মৃত্যুর প্রতি গভীর ভালোবাসার প্রত্যয়শীলতা থেকে নৈবেদ্যে জীবন মৃত্যুর অদ্বৈত সংযোগের কথা বলেছেন কবি। 'স্মরণে' মৃত্যুর মাধ্যমে কবিজীবনে 'বাধাহীন মিলনের নিবিড় সঞ্চার' হয়েছে। আর 'উৎসর্গে' মিলনের এই নিবিড় উপলব্ধি থেকে কবিপ্রাণ রহস্যময় মৃত্যু-রাজ্যে প্রত্যাগমনে প্রত্যাশী,

আমি যাব যেথা তব তরী বয়
ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
যেথা অকুল হইতে বায়ু বয়
করি আঁধারের অনুসরণ।
যদি দেখি ঘণঘোর মেঘোদয়
দূর ইশানের কোণে আকাশে,
যদি বিদ্যুৎফণী জ্বালাময়
তার উদ্যত ফণা বিকাশে।

আমি ফিরিব না করি মিছা ভয়
আমি করিব নীরবে তরণ
সেই মহা বরষার রাঙা জল
ওগো মরণ, হে মোর মরণ। [৯৫ নং কবিতা

গভীরতম বিচারে স্পষ্ট হবে উদ্ধৃতাংশটি কতখানি উপমাত্মক। কোথাও উপমেয়ের স্পষ্ট উল্লেখ নেই, উপমানই যেন উপমেয়ের কাজ করছে। বিদ্যুৎকে সাপের সাথে তুলনা করেছেন, কিন্তু তার উল্লেখ কোথায়? 'সেই মহাবরষার রাঙা জল' তো মৃত্যুসমুদ্রই। কবিকল্পনার একাকিত্বে সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্য একাকার হয়ে গেছে। রবীন্দ্র কাব্যে উপমা লক্ষণের মধ্যে এই একাকার হয়ে যাওয়ার বৈশিষ্ট্যটি সর্বোত্তম এবং এর জন্যেই রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠ উপমাশিল্পী বললে অত্যুক্তি হয় তো হয় না। উপমা যে কবিকৃতির স্বাভাবিক প্রকাশ এইখানে তার প্রমাণ মেলে।

বলাকা

যৌবন প্রাখর্য ও গতিরাগের শক্তি নিয়ে বলাকা কাব্য রবীন্দ্রকাব্য ধারার নবজন্ম দিয়েছে। পুর্বোক্ত কাব্যবিচারে আমরা দেখিয়েছি রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্ম-সাধনায় নিযুক্ত হয়েছেন এবং বিশ্বদেবতার উদ্দেশ্যে স্বকীয় সত্তাকে নিবেদন করেছেন। কিন্তু বলাকা আত্মবিকাশের বলিষ্ঠতা নিয়ে এলো এবং কাব্য প্রকৃতিতে নতুনত্বের সঞ্চার করলো। এই নতুনত্ব আর কিছু নয়, আধুনিক বিশ্বজীবনবাদের সঙ্গে রবীন্দ্র মানসের সংযোগ। সংযোগ সাধিত হতো না যদি না রবীন্দ্রনাথের মানস পটে পাশ্চাত্য জীবন পদ্ধতির কর্মময় প্রেরণার প্রভাব যুগপরিবেশধৃত আবহে উচ্চকিত হতো। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে, নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তি এখনো ঘটেনি, রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ ভ্রমণে যান ; বিভিন্ন দেশ ঘুরে ঘুরে যুদ্ধকালীন তপ্ত আবহাওয়ায় ইউরোপীয়দের পরস্পর হিংসা দ্বেষ ও বিক্ষুব্ধতা দেখে কবির মনে হলো 'আমরা মানবের এক বৃহৎ যুগসন্ধিতে এসেছি'। যুদ্ধ তখনো শুরু হয়নি, কিন্তু শঙ্খ বেজে উঠেছে। চরম সংঘর্ষের আশঙ্কা ঝড়ের প্রথম বিক্ষুব্ধতা বয়ে নিয়ে এসেছে। সে বিক্ষুব্ধতা যেন 'লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল' 'বহ্নিবন্যা তরঙ্গের বেগ ; 'বিষশ্বাস ঝটিকার মেঘ', কিংবা 'ভূতল গগন মূর্চ্ছিত করা মরণে মরণে আলিঙ্গন'। কিন্তু কবির দৃষ্টি কখনো আচ্ছন্ন নয়, মানবজীবনের সে সংঘর্ষতাড়িত সময়কালেও তিনি নতুন জীবন প্রভাতের অপেক্ষায় আছেন, অপেক্ষায় আছেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ভাবী অগ্রপথিকদের।

কবির ভাষায় বলা চলে,

> পাশ্চাত্য দেশে এসেছি, সেই ঘরছাড়ার দল আজ বেরিয়ে পড়েছে। তারা এক ভাবীকালকে মানসলোকে দেখতে পাচ্ছে, যে কাল সর্বজাতির লোকের। চাকভাঙা মৌমাছির দল বেরিয়ে পড়েছে, আবার নূতন করে চাক বাঁধতে। শঙ্কের আহ্বান তাদের কানে পৌঁচেছে।[২৭]

একই ভাব নিম্নের উপমাময় উদ্ধৃতিতে রয়েছে,

তবে ঘরছাড়া সবে
অন্তরের কি আশ্বাস রবে
মরিতে ছুটিছে শতশত
প্রভাত আলোর পানে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের মতো।
[৩৭ নং কবিতা

সুতরাং যে জীবন কামনা করা হচ্ছে তা সর্ববন্ধনমুক্ত বিশ্ব পটভূমিকায় বিন্যস্ত। এ জীবন শান্তিস্থিতি ও সর্বপ্রকার জড়তামুক্ত, যৌবনের প্রচণ্ড উল্লাসে, গতিবেগের আনন্দে সম্মুখপানে এগিয়ে যাবার প্রেরণাসম্মত। বলাকার ভাবপরিকল্পনায় যেমন রয়েছে তির্যক অনুভূতির উপলব্ধি, ভাষাও তেমনি হয়ে উঠেছে প্রখর গতিবেগ-সম্পন্ন। বলাকা কাব্য নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র কবিভাষার শ্রেষ্ঠতা প্রমান করে। উপমাও এ পর্বে হয়ে উঠেছে ঐশ্বর্যপূর্ণ ও কল্পনা সমৃদ্ধ। 'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা/আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে ঢাকা/বাঁকা তলোয়ার'—এই উপমার মধ্যে তীক্ষ্ণ গতিময়তা সহজেই লক্ষনীয়। সন্ধ্যার অন্ধকার ঝিলম নদীর বিসর্পিল স্রোতরেখা আবৃত করেছে—এই চিত্রটিকে কবি খাপে ঢাকা বাঁকা তলোয়ারের সাথে উপমিত করে কল্পনা সমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে, কিন্তু উপমাটির সার্থকতা শুধু এইখানে নয়। ঝিলমেরর প্রখর স্রোতরেখা যেন খাপমুক্ত তলোয়ারের উন্মুক্ত ধারালো সৌন্দর্যের ভাবনার অনুষঙ্গ জাগায়—এ ইংগিতটুকু খুঁজে নেওয়ার কাজ পাঠকের। এ ধরণের তীক্ষ্ণ ইন্দিয়বেদী উপমাই বলাকা কাব্যের বৈশিষ্ট্য। আরো একটি উদাহরণ,

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে।
। বলাকা

সান্ধ্যকালীন ঝিলমের দুপাশে 'গিরিতটতলে' সারি সারি দেওদার-তরুর অরণ্যে যে পুঞ্জ পুঞ্জ নিস্তব্ধতা ঘণিয়ে উঠেছিল, হঠাৎ হংস বলাকার ঝঞ্ঝায়িত পক্ষধ্বনিতে সে নিস্তব্ধতার তপোভঙ্গ ঘটলো। এ ভাবটি বোঝাবার জন্যে উপমা যে সবিশেষ ঐশ্বর্যমণ্ডিত হয়েছে তা সম্ভবত বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। হংস বলাকার পাখার শব্দ যেন বিদ্যুৎছটা, সাধারণ উপমার কোন ভাব প্রত্যয় নয়, একেবারে দৃঢ় ঘণীভূত উপমার নিদর্শন, শ্রবণেন্দ্রিয় আর দর্শনেন্দ্রিয়কে সংযুক্ত করার কি সার্থক প্রয়াস! পরবর্তী এক চরণে পক্ষধ্বনিকে শব্দময়ী অপ্সর রমণীর সাথে উপমিত করা হয়েছে, উপমা হিসেবে এটিও কল্পনার প্রসারণশীলতার রূপায়নিক, কিন্তু 'শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা'র মতো নয়। বলাকা-পূর্ববর্তী কোন কাব্যে কবিভাষায় এমন চমৎকৃতি লক্ষণীয় নয়, সম্ভবতঃ পরের কোন কাব্যেও নয়। বলাকা রবন্দ্রীনাথের কাব্য সাধনার মধ্যাহ্ন, অর্থাৎ সৃষ্টির ক্রমবিকাশের শীর্ষপর্যায়ের। সে জন্যে কবিভাষার মধ্যে ভাব ও কল্পনার এমন ঐশ্বর্যময়তা প্রতিভাত। এই ঐশ্বর্যময়তার আরো পরিচয় দেবে নীচের বাক্যাংশগুলো যেযন,—'রক্ত আলোর মদ', 'যৌবনেরই পরশমণি', 'স্থিরতার চিরঅন্তপুর', 'মালঞ্চের চঞ্চল অঞ্চল', 'সময়ের হৃদয়', 'প্রেমের করুণ কোমলতা', 'সৌন্দর্যের পুষ্প পুঞ্জ', 'ভাষার অতীত তীর', 'স্মৃতির পিঞ্জর দ্বার', 'বিস্মৃতির মুক্তিপথ', 'স্মরণের আবরণ', 'সমুদ্রস্তনিত পৃথী', 'প্রভাতের সিংহদ্বার', 'ধাবমান অন্ধকার', স্থিররেখার বন্ধন', 'নিস্তব্ধ ক্রন্দন', 'শব্দহীন সুর', 'অন্তহীর দূর', 'ঝোড়ো এলোচুল', 'বিদ্যুতের দুল', সঞ্চয়ের অচল বিকার', সন্ধ্যার জবরী', শূন্য পিপাসা', প্রতীক্ষার দীপ', 'অদৃশ্যের অন্ধমরু', 'মৃত্যুর গুপ্তপ্রেম', 'অশ্রুজলের ঢেউ', 'সন্ধ্যারবির স্বর্ণ কিরীট', 'বজ্রমাণিক', অশ্রুর শিশির-স্নান', 'রক্তবরণ হৃদয় ব্যথা', 'শূণ্যের আড়াল', 'আলোর আনন্দ কুসুম', 'তারার ছায়াতরী', 'অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ', নিশ্চলের অন্তর,' শব্দরেখা,' 'নিশব্দের তল' অঙ্কুরের পাখা', 'বীজের 'পুলকিত বলাকা', 'নক্ষত্রের পাখার স্পন্দন', 'অন্ধকার আলোর ক্রন্দন', 'ঝটিকার কণ্ঠ', ইত্যাদি। এ ধরণের অনেক উপমা লক্ষণাত্মক বাক্যাংশ বলাকা থেকে তুলে নেওয়া যায়। আকাঙ্খিত ধ্বনিব্যঞ্জনা সমৃদ্ধ ও স্থিতিস্থাপক-

গুণসম্পন্ন (Elastic) উচ্চকিত ভাষারূপের সামগ্রী এগুলো। লক্ষণীয় যে প্রতেকটি বাক্যাংশে দুই বিপরীত অন্বিষ্ট করার শৈল্পিক প্রয়াস দেখা যায়, সেদিক থেকে উপমাও তার কাজ করে যায়, যেহেতু উপমার কাজও দুই বিপরীতের সমন্বয় সাধন। কল্পনায় সমন্বিত প্রয়াগ্রের সম্ভাব্যতা আছে বলে কখনো কখনো কবিভাষা প্রসারিতরূপে সমৃদ্ধ ও উজ্জল হয়ে ওঠে। বলাকায় 'প্রলয়-পারাবার', 'মরণ-বন', 'হৃদয়-বন', 'প্রাণ -বসন্ত', ইত্যাদি গতানুগতিক রূপক-অলঙ্কারও আছে,[২৮] কিন্তু তারা উল্লেখিত উপরোক্ত বাক্যাংশগুলোর ঐশ্বর্যশালিতায় কোন খর্বতা আনতে পারে না। শব্দচয়নে উপমাকে কত আত্মীকৃত করা যায় তার সর্থক প্রচেষ্টা বলাকা কাব্যেই পরিস্ফুট। ভাষা যদি ভাবের বাহন হয়, তাহলে বলাকার বেশ কয়েকটি কবিতাই নিটোল রূপ পেয়েছে।

বলাকার কিছু কিছু কবিতায় ভুলে যাওয়া যৌবনের অনুসরণে স্মৃতিচারণ অজ্ঞিতায় আনন্দ শিহরণের উল্লাস আছে।[২৯] সে উল্লাসে উদ্দামতা নেই, আছে সৌম্য প্রশান্তি। 'শাজাহান' কবিতায় 'তাজমল' দেশকালাতীত নিখিল মানবমানবীব প্রেমের স্মারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'সময়ের হৃদয়হরণ' করে তাজের সৌন্দর্য সর্বমানবের অন্তরের আনন্দ বেদনার মধ্যে প্রেমের স্মৃতি জাগরুক রেখেছে। উপমার ভাষায় বলতে হয়, তাজ শুধু তাই 'পাষাণ সুন্দরী' নয়, প্রেমের জীবন্ত প্রতীক, 'শুধু একবিন্দু নয়নের জল/কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল'। 'হীরা মুক্তামাণিক্যের ঘটা, শূন্যদিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধধুচ্ছটা'র মতো লুপ্ত হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তাজের সৌন্দর্যে সম্রাট তাঁর প্রিয়তমার যে বস্তুভারনিরপেক্ষ প্রেমকে অবিনশ্বর করে রেখেছেন তা কখনো ম্লান হয়ে যাবার নয়। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনার কালাতীতরূপ এই কবিতাটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

পূরবী থেকে পরিশেষ

নোবেল প্রাইজ পাওয়ার[৩০] পর, রবীন্দ্রনাথের সাথে বিশ্বজীবনেয় নিকটতম সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। কবি পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়ালেন, দেখলেন বিশাল বিপুল জীবন বিস্তার। বলাকা কাব্য থেকে রবীন্দ্রনাথের 'ভূকেন্দ্রিক' দৃষ্টি ভঙ্গির প্রসারণ ঘটেছে বললে সম্ববতঃ ভুল হয় না। কাব্যজীবনে এমন কতগুলো পর্যায় আসে যার ফলে কবির বোধ ও উপলব্ধির নতুনত্ব সধিত হয় এবং সেই আলোকে কাব্যধারার গতিও পরিবর্তিত হয়। বলাকা পূর্ববর্তী কাব্যগুলোতে আমরা

দেখি রবীন্দ্রনাথের ধর্মবুদ্ধিপ্রবণ গভীর অধ্যাত্ম চেতনা, বলাকাতে নতুন জীবনস্পৃহার মহাবানী এবং তদপরবর্তী কাব্যগুলো পলাতকা, পূরবী মহুয়া, পরিশেষ ইত্যাদিতে জীবনপ্রেমের সুগভীর মর্মানুভূত আকুলতার প্রকাশ ঘটেছে। বলকার 'শাজাহান' 'ছবি' কবিতা দুটিতে করি ভুলে যাওয়া যৌবনের অনুসরণে যে স্মৃতি রূপায়ণ করেছেন পূরবীতে ব্যথাময় আনন্দের লীলারসে তা ব্যক্ত হয়েছে। পূরবী একটি নিছক প্রেমের কাব্য, প্রৌঢ় কবির প্রশান্ত প্রেমানুভূতির আনন্দময় উপলব্ধির কাব্য; মহুয়াও তাই। "বনবাণী"তে নিসর্গচর্চা ও পারিশেষে আত্মবিশ্লেষণের পালা চললেও জীবনপ্রেমের আনন্দ কোথাও লুপ্ত হয়ে যায়নি। রসানুভূতির প্রাবল্যে কবিহৃদয়ে প্রেম ও সৌন্দর্য নবনব রূপে উপলব্ধ হয়েছে। নারীর প্রেম, মানবপ্রেম প্রকৃতির সৌন্দর্য, সবকিছু মিলে মিশে একাকার হয়ে স্নিগ্ধ অনুভবের জন্ম দিয়েছে। এইজন্য এসব কাব্যের ভাষাও হয়ে উঠেছে ভাবের মতোই স্নিগ্ধ, অনুভূতিসিক্ত, শ্রাবণের জলভরা মেঘের মতো রসপূর্ণ। এই পর্বে উপমা সৃষ্টিতে কবির সযত্ন প্রয়াস নেই। আলঙ্কারিক কলাকৌশলবিমুক্ততার কথা বলা হচ্ছে না, হচ্ছে ভাব প্রকাশের স্বাভাবিক রীতির কথা। সেদিক থেকে উপমা যা সৃষ্টি করেছেন কবি, তা ভাবনার স্বাভাবিক স্নিগ্ধতার সাথে জড়িত। অবশ্য বলাকার প্রখর কল্পনা সমৃদ্ধ উপমারীতিও আছে। যেমন,

নির্জন প্রান্তর তলে আলেয়ার আলো জ্বলে
বিদ্যুৎবহ্নির সর্প হানে ফণা যুগান্তের মেঘে।

'শব্দের বিদ্যুৎ-ছটা'র সাথে 'বিদ্যুৎ বহ্নির সর্পে'র রীতিগত সযুজ্য সহজেই লক্ষণীয় এবং সন্দেহ নেই এ জাতীয় উপমায় রয়েছে রবীন্দ্র কাব্য-ভাষার সহজ শ্রেষ্টতা। তবুও পূরবী কাব্যের উপমা সম্বন্ধে বলা যায় তার মধ্যে রয়েছে স্নিগ্ধ অনুভব গম্যতার সাঙ্গীতিক রেশ। পূরবীর 'সাবিত্রী' কবিতায় আছে,

এ প্রাণ তোমারি এক ছিন্ন তান, সুরের তরণী—
আয়ু স্রোত বুকে
হাসিয়া ভাসায়ে দিলে লীলাচ্ছলে, কৌতুকে ধরণী—
বেঁধে নিল বুকে।
আশ্বিনের রৌদ্রে সেই বন্দী প্রাণ হয় বিস্ফূরিত
উৎকণ্ঠার বেগে, যেন শেফালীর শিশিরচ্ছূরিত
উৎসুক আলোকে।

শুধু বোঝাবার জন্য বা ব্যাখ্যার জন্য নয়, কিংবা শুধু এক পৌরাণিক ঘটনার ইংগিতও নয় ৩১, কবির প্রাণের হালকা অথচ শিশিরধোয়া উপলব্ধির জন্ম দেয় উপমাটি। কবিকল্পনায় প্রাণ 'সুরের তরণী' রূপে 'আয়ুস্রোত মুখে' ভেসে যাচ্ছে, কৌতুকময়ী ধরণী তাকে বুকে বেঁধে নিল, বন্দী প্রাণ শিশির বিচ্ছুরিত আলোর মতো উৎকণ্ঠায় কাঁপছে। সবকিছু যেন একটি শৃঙ্খলায়িত সূত্রে আবদ্ধ। আরো একটি উপমার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে,

সুরেয় ডোরে গাঁথনি করে
রচিয়া মম বিরহ মালা
রাখিয়া যাব চরণে।
[গানের সাজি ঃ পূরবী

লীলাসঙ্গিণীর উদ্দেশ্যে সুরের ডোরে বিরহমালা গাঁথার কল্পনা সত্যই অপূর্ব। উপমা হিসেবে 'সুরের তরণী', 'সুরের ডোর' সত্যই বিস্ময়কর, ধরা ছোঁওয়ার বাইরে যা তাকে বস্তুগত অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করবার বিশেষ মানসিকতা বংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যেই প্রথম দেখা গেছে। সেদিক থেকে উপমা শিল্পী হিসেবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য সহজেই লক্ষণীয়। বনবাণীর 'বসন্ত' কবিতাতে বসন্তের কামনা করে কবি বলছেন,—

সে বন্ধন দোলরজ্জু. স্বর্গে মর্তে দোলে ছন্দভরে
সে বন্ধন শেতপদ্ম, বাণীর মানস সরোবরে—
সে বন্ধন বীণাযন্ত্র, সুরে সুরে সংগিতনির্ঝরে
বর্ষিছে ঝংকার।

বসন্তের বর্ণাঢ্য রূপমাধুর্য সুধু মর্ত্য পৃথিবীতে আবদ্ধ নয়, স্বর্গে মর্ত্যে সবস্থানেই তার বিচরণ, কখনো বাণীর মানস সরোবরে শ্বেতপদ্মরূপে, কখনো বীনাযন্ত্রের সংগীত নির্ঝরে বসন্ত পরিব্যাপ্ত। এখানেও উপমার প্রক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে।

'মহুয়া'ও নিছক প্রেমের কাব্য, রূপে রসে বর্ণে সে প্রেম কখনো প্রসাধনকলাকে প্রধান্য দিয়েছে, উপমা তার প্রমাণ দেয়।

পলাশের কুঁড়ি
একরাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ;
শিমুল পাগল হয়ে মাতে,
অজস্র ঐশ্বর্যভরে তার দরিদ্র শাখাতে
পাত্র করি সুরা
আকাশে আকাশে ঢালে রক্ত যেন সুরা।
[শুভযোগ : মহুয়া

উদ্ধৃতির সম্পূর্ণ অংশই অপূর্ব চিত্র। এখানে 'বর্ণবহ্নি' আর 'রক্তফেনসুরা' উপমা দুটি চিত্রাত্মক তো বটেই, তবে সাধারণ চিত্র নয়, কবিকল্পনার পরিশীলিত স্তর থেকে চিত্রের সৃষ্টি। রূপে রসে বর্ণে অন্তরের উপলব্ধিকে প্রকৃতিতে সঞ্চার করে দেবার উচ্ছ্বসিত স্ফূর্তি মহুয়া কাব্যে পরিলক্ষিত, কিন্তু মহুয়ার সম্পূর্ণ পরিচয় এ নয়। কবির কথায় বলা চলে, "মহুয়ার কবিতা চিত্তের সেই মায়ালোকের কাব্য, তার কোন অংশে ছন্দে ভাষার ভঙ্গিতে এই প্রসাধনের আয়োজন, কোন অংশে উপলব্ধির প্রকাশ।"[৩২] শুধু মহুয়া নয়, পরিশেষ, বিচিত্রিতা ইত্যাদি কাব্যেও প্রসাধন বর্জিত উপলব্ধির প্রকাশ উপমা সৃষ্টিতে দেখা গেছে। যেমন,

১. সজল সন্ধ্যায় তুমি এসেছিলে, সখী,
একটি কেতকী। [পরিচয় : মহুয়া

২. আজি শুভদৃষ্টি তব
বিরহণ্ঠন তলে দেখে যেন মোরে অভিনব
অপূর্ব অনন্দ ভরে, আজি যেন সকল সন্ধান
প্রভাতে নক্ষত্র সম শুভ্রতায় লভে অবসান।
[প্রত্যাগত ; পরিশেষ

৩. তুমি ভাব, সেই রাত্রি দিন
চিহ্নহীন
মল্লিকা গন্ধের মতো
নির্বিশেষে গত।
[ছয়াসঙ্গিনী : বিচিত্রিতা

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে উপরোক্ত উপমাগুলোতে আবেগের তীব্রতা নেই, আছে উপলব্ধির রসময়তা। রসাশ্রিত কল্পনার শান্তাবস্থা থেকে উপমাগুলো সৃষ্ট এ ধারণা সহজেই করা চলে। পূরবী কাব্যে প্রৌঢ় কবির প্রেমানুভূতির যে প্রশান্তি লক্ষ্য করা গেছে, এ পর্বের সমস্ত কাব্যগুলোতে সে প্রশান্তিই স্থায়ী থেকেছে। এই কারণে এ পর্বের উপমার সৌন্দর্য 'থির বিজুরী'র মতো, যা প্রখর নয়, উদ্দীপকও নয়, কিন্তু তার অচঞ্চলতা ও স্তব্ধতামণ্ডিত রূপটি উপভোগ করার।

গদ্য কবিতা : পুনশ্চ থেকে শ্যামলী

পুনশ্চ কাব্যে রবীন্দ্রনাথ নতুন কাব্য প্রকরণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুনশ্চ, শেষ সপ্তক, পত্রপুট ও শ্যামলীতে আঙ্গিকের নবরূপায়ন দেখি। এ নবরূপায়ন হলো গদ্যছন্দের প্রতিষ্ঠা। শুধু মাত্র ছান্দিক নবরূপায়নের মধ্যেই এই পর্বের কাব্য-গুলোতে বৈপরীত্য সাধিত নয়, বিষয়গত পরিবর্তনও লক্ষিত। বলকায় বিশ্ব মানব সমাজের জন্য ব্যক্তি মানুষের যে বেদনার প্রকাশ হয়েছিল তা আরো ব্যক্তিকেন্দ্রিক বুদ্ধিবৃত্তির সম্পন্নতার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত কাব্যগুলোতে চরিতার্থতা লাভ করেছে। মানুষ তার অস্তিত্ব, ছোটখাট সুখদুঃখ, টুকরো টুকরো স্মৃতি ও সামান্যতম ঘটনার মধ্য দিয়েও কবি ভাবনায় চিরদিন বেঁচে থাকবার প্রয়াসী। মানবিকতা ও ইন্দ্রিয়-গোচর প্রত্যক্ষতার যে অভ্যুদয় তা তাৎক্ষণিক বা হঠাৎ নয়, রবীন্দ্রমানসে ক্রম-বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার প্রতিপালন হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনার সেটাই লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য যেখানে প্রকাশ বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নানারূপ ও রসের আধারে তাঁর কাব্যসাধনা সম্মুখ পানে এগিয়ে গেছে। এ বিবর্তন ধর্ম যেমন প্রকরণগত, তেমনি বিষয় গতও। যুগধর্মের প্রভাবে রবীন্দ্র কাব্য মানুষের দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে, ছন্দও তেমনি বিষয়কে অনুসরণ করেছে। কবির কথায় বলা চলে,

> কাব্য প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত থেকে যতদূরে ছিল এখন তা নেই। এখন সমস্তকেই আপন রসলোকে উত্তীর্ণ করতে চায়—এখন সে স্বর্গারোহণ করবার সময়েও সঙ্গের কুকুরটিকে ছাড়ে না।
>
> বাস্তব জগৎ ও রসের জগতের সমন্বয় সাধনে গদ্য কাজে লাগবে, কেননা গদ্য শুচিবায়ুগ্রস্ত নয়।[৩৩]

বিষয় ও প্রকরণের এই যে নব প্রকাশ, বলাকা পরবর্তী কাব্য সাধনায়, স্পষ্টতঃ গদ্য কাব্যগুলোতে রবীন্দ্রমানসের রূপান্তর এনেছে। ভাষাকে ধ্বনি গাম্ভীর্য থেকে, নিয়ন্ত্রিত আলঙ্কারিক কৌশল থেকে অন্তর্নিহিত ভাবের উপর কতখানি প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন তা পরিস্কার হবে যখন আমরা দেখি উপমারীতিতে রবীন্দ্রনাথ কতখানি জীবনের কাছাকাছি এসেছেন, যদিও ভাব হয়েছে আখ্যায়িকা ধর্মী, ভাষাও আটপৌরে, প্রয়োজনের সীমাবদ্ধতাকে অঙ্গীকৃত করার মতো পর্যপ্ত। অবশ্য উপমারীতির নতুনত্ব মহুয়ার একটি জায়গায় দেখা গেছে,

> গলিত মাংসের যেন ক্রিমিগুলি
> কল্পনা বিকার তার, শিথিল চিন্তার তলে তলে
> আকুলিতে থাকে কিলিবিলি। [স্পর্ধা : মহুয়া

বিচার সম্পন্ন কল্পনা গলিত মাংসের ক্রিমিরূপে বিধৃত হয়েছে, সেদিক থেকে এ উপমা 'প্রাত্যহিক সংসারের অপরিমার্জিত বাস্তবতা' নির্ভর। পুনশ্চ কিংবা পরবর্তী কাব্যগুলোতে কোন কোন কবিতার উপলক্ষ অপরিমার্জিত বাস্তবতা সন্দেহ নেই, কিন্তু উপমা এখানে জীবনবেদনার মর্মানুভূত বাস্তব সত্যের প্রকাশক। যেমন,

> ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা দেওয়া
> মাইনের মতো,
> বহু ছিদ্র তার। [বাঁশি : পুনশ্চ

উপমেয়ের চেয়ে উপমানের দিকটাই উপমাটিতে প্রাধান্য পেয়েছে, কেননা বঙ্গদেশীয় ছাপোষা কেরানীকুলের জীবনচিত্র উপমাটি, কবিতাটিতে তার উল্লেখও আছে।[৩৪] এই সেই কেরানীকুল যাদের ছাতার অবস্থা যা-ই যোক, জীবনটা তো বহু ছিদ্রময়। এ রীতির আরো উপমার সন্ধান করা যায়।

১. আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা [ক্যামেলিয়া : পুনশ্চ
২. নিরীহ দিনগুলো ব্যঙের মতো এক ঘেয়ে ডাকে [ঐ
৩. ছেলেটার বয়স হবে বছর দশেক
পরের ঘরে মানুষ

যেমন ভাঙ্গা বেড়ার ধারে আগাছা—
মালীর যত্ন নেই
আছে আলোক বাতস বৃষ্টি
পোকামাকড় ধুলোবালি,—
কখনো ছাগলে দেয় মুড়িয়ে
কখনো মাড়িয়ে দেয় গরুতে। [ছেলেটা : পুনশ্চ

৪. আমার ভালবাসা
যেন সেই আল-ভেঙে-যাওয়া খেতের মতো
অনেকদিন হলো চাষী যাকে
ফেলে দিয়ে গেছে চলে। [হারানো মন : শ্যামলী

প্রত্যেকটি উপমাই জীবনধর্মী, মানুষের ব্যাথা বেদনা ও দুঃখ যন্ত্রণার ভাবগুলো যথাযথ অর্থে ব্যাখ্যাত। কল্পনা কোথাও প্রত্যক্ষ বাস্তবতা বহির্ভূত নয়। বাদলের কালো ছায়া / স্যাঁতসেঁতে ঘরটাতে ঢুকে / কলে পড়া জন্তুর মতন / মূর্চ্ছায় অসড়।[৩৫] কিংবা 'এ গলিটা ঘোর মিছে / দুর্বিসহ মাতালের প্রলাপের মতো'[৩৬]— এ দুটি উপমার ভাষারীতির মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা পূর্বোক্ত উপমাগুলোর সমান্তরাল বিচারে হয়তো বা ততখানি ঘনীভূত নয় বলে কেউ কেউ মনে করতে পারেন, কিন্তু তারতম্য মাত্রাগত, বিষয়গত নয়। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা দরকার, গদ্যকাব্য-পূর্বতন উপমাগুলোর সাথে এ উপমাগুলোর রীতিগত পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে। কবি-ভাবনা কতখানি 'মাটির কাছাকাছি' বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জীবন-সম্ভূত এবং বিপুল জনসাধারণের বিচিত্র পথে সর্বত্রগামী হবার প্রেরণায় উচ্চকিত তাও সুস্পষ্টরূপে অনুমেয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, রূঢ় বাস্তবতার প্রকাশের মধ্যেই রবীন্দ্রকাব্যে সার্থকতা এসেছে এ জাতীয় চিন্তাও অসমীচীন। ভাব ভাষা ও ছন্দের সম্মিলনীতে সুরের আবেশময় রস প্রকৃতিতে আত্মলীন থাকবার একটি স্বাভাবিক সাঙ্গীতিক আকুলতা রবীন্দ্রনাথের কবি স্বরূপের বৈশিষ্ট্য, এতেই কবিতা আটপৌরে অবস্থা কাটিয়ে যথার্থ কাব্যিক ব্যঞ্জনা লাভ করে। গদ্যের সমতলভূমিতে সুরের অরূপতা সম্বন্ধে কবি বলেন,

গদ্যকে যদি ঘরের গৃহিনী বলে কল্পনা করো, তাহলে জানবে তিনি তর্ক

> করেন, ধোবার বাড়ীর কাপড়ের হিসেব রাখেন, তাঁর কাশি, সর্দি, জ্বর প্রভৃতি হয়, 'মাসিক বসুমতী' পাঠ করে থাকেন, এ সমস্তই প্রাত্যহিক হিসেব, সংবাদের কোঠার অন্তর্গত, এই ফাঁকে ফাঁকে মাধুরীর স্রোত উছলিয়ে ওঠে পাথর ডিঙিয়ে ঝরণার মতো। সেটা সংবাদের বিষয় নয়, সংগীতের শ্রেণীয়। গদ্যকাব্যে তাকে বাছাই করে নেওয়া যায় অথবা সংবাদের সংগে সঙ্গীত মিশিয়ে দেওয়া চলে।[৩৭]

সুতরাং 'সংবাদের সঙ্গে সংগীত মিশিয়ে' নিয়ে ভাব ও সুরের স্নিগ্ধ অনুভূতি সৃষ্টির রীতিও গদ্য কাব্যগুলোতে রয়েছে। এ পর্বের কিছু কিছু উপমাও এই বিশ্লেষণে ভাবসমৃদ্ধ কল্পনার সৃষ্টি করেছে, শুধুমাত্র রৌদ্রদগ্ধ বাস্তবতার সৃষ্টি করেনি। সেজন্যে চাটুবাক্যের মুষলধারা বর্ষণের মাঝখান দিয়ে যে মেয়ে চলেছে অবহেলায় সে 'ঢেউয়ের উপর দিয়ে যেন পালের নৌকা',[৩৮] আম জাম তেতুলে ঢাকা সাঁওতাল পাড়ার পাশ দিয়ে যে ছায়াহীন দীর্ঘপথ গেছে বেঁকে তা 'রাঙা পাড় যেন সবুজ শাড়ির প্রান্তে কুটিল রেখায়'[৩৯] কিম্বা 'ক্রন্দিত আকাশের নীচে ওই ধুসর বন্ধুর কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে / লাল সমুদ্রে তুফান উঠলো'।[৪০] এ উপমাগুলো চিত্রধর্মী উপমার প্রকৃষ্ট নিদর্শন, এ ছাড়া এ গুলি কবিকল্পনার স্নিগ্ধ অনুভূতির প্রকাশকও। এতে বোঝা যায় গদ্যের প্রয়োগরীতিগত সচেতন সযত্নতা সর্বত্র রক্ষিত নয়, পুনশ্চ ও শেষ সপ্তকে রক্ষিত হলেও পরবর্তী কাব্যদুটো 'পত্রপুট' ও 'শ্যামলী' ভাব, ভাষা ও ভঙ্গিতে অনেকটা রূপরীতিগত কাব্য হয়ে উঠেছে। পত্রপুট থেকে একটি উপমাত্মক অংশের বিশ্লেষণ চলতে পারে,

> বৈশাখে দেখেছি, বিদ্যুৎ চক্ষুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিয়ে এল
> কালো শ্যেনপাখীর মতো তোমার ঝড়;
> সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠলো যেন কেশরফোলা সিংহ [পৃথিবী

'বিদ্যুৎ চক্ষুবিদ্ধ দিগন্ত', 'কালো শ্যেনপাখীর মতো ঝড়', 'আকাশ যেন কেশর ফোলা সিংহ' — প্রত্যেকটি উপমাই কবিকল্পনার সমুন্নত প্রকাশরূপ। প্রশংসাযোগ্য চিত্রধর্মে ও ভাষার ধ্বনি গাম্ভীর্যে উপমা কয়টি সমৃদ্ধ, যদিও উপমেয় উপমানের সাযুজ্যে গভীর কোন ইংগিত নেই। রবীন্দ্রনাথের এও এক ধরণের গদ্যকাব্যিক উপমা। কবি যখন আবার বলেন,

আজ ছাড়িয়ে পড়েছে আমার হালকা চেতনা—
যেন কৃষ্ণপক্ষের গভীর আকাশে নীহারিকা,
যেন বর্ষণশেষে মিলিয়ে আসা সাদা মেঘ
শরতের নীলিমায়। [হারানো মন/শ্যামলী

তখন রবীন্দ্রনাথের উপমার আরেকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। এ জাতীয় উপমায় সুরের আবেশ উপলব্ধির স্নিগ্ধতায় লীন হয়ে গেছে। হালকা চেতনার পাথে যা কিছু উপমিত হয়েছে সবকিছু বস্তুভারহীন নির্যাসের মতো ছাড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

প্রান্তিক শেষ লেখা

জীবনের শেষ চারটি বছর[৪১] রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাধনা প্রাচুর্যে ভরপুর, এ সময়ে অন্তত ছয়খানি কাব্য রচনা করেন কবি। এই পর্বের কাব্যগুলোতে কবি বস্তু পৃথিবীর প্রশান্তি ও বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করেছেন মৃত্যুর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কাব্য ভাবনা এ কারণে একমুখীন ও বৈচিত্র্যহীন, বর্ণচ্ছটার কোন রঞ্জনা নেই, আছে উপলব্ধির বিষন্নতা। একই কারণে কবিভাষাও সম্পুর্ণ আলঙ্কারিক কলাকৌশল বিমুক্ত, উপমাতে তাই লক্ষনীয় বঞ্জনা নেই। এ পর্বের কোন কাব্য অবশ্য মৃত্যু-চেতনার বাইরের ব্যাপার, যেমন ব্যঙ্গাত্মক 'প্রহাসিনী' কাব্য। 'রাতটা যেন কুলি-মাগী / এলো কালো রঙের উপর কালীর প্রলেপ মেখে' — প্রহাসিনীর রস সমৃদ্ধ কবিতা 'মাল্যতত্ত্বে'র এই উপমা পুনশ্চ পর্বের সাযুজ্য রক্ষা করে যেন। 'দিনটা যেন খোঁড়া পায়ের মতো / ব্যাণ্ডেজেতে বাঁধা' — সানাইয়ের এই উপমাও একই রীতির। তবু সাধারণভাবে বলা চলে এ পর্বের কাব্যগুলোতে মৃত্যুচিন্তা সমাকীর্ণ বলে 'নিরলংকার স্বল্পভাষিতা'র মধ্যে বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। 'দেয়ালের মতো ধুসর মৃত্যুর মুখে'র উপলব্ধি কবিচিত্তে প্রথম জেগেছে প্রান্তিক কাব্যে, সদ্যরোগমুক্তির পর।[৪২] উপমা এর পরিচয় বহন করে,

অবরুদ্ধ ছিল বায়ু ; দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার।
[অবরুদ্ধ ছিল বায়ুঃ প্রান্তিক

কিম্বা,

আজি মুক্তিমন্ত্র গায়
আমার বক্ষের মাঝে দূরের পথিক চিত্ত মম
সংসার যাত্রার প্রান্তে সহসরণের বধূসম। [ঐ

'অবসন্ন চেতনার গোধূলী বেলায়' 'কালো কালিন্দীর স্রোতে' দেহ ভেসে যাওয়ার অনুভূতিপুঞ্জ নিয়ে কবি আজন্মের স্মৃতিচারণ করছেন মৃত্যুর বেদনার মধ্য দিয়ে। জীবন সাধনার বিচিত্র পথে যে অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ঘটেছে মৃত্যুর প্রান্তে এসে কবি-হৃদয়ে বারবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে কখনো সার্থকতার তৃপ্তি নিয়ে কখনো অসাফল্যের বেদনা নিয়ে। কিন্তু মৃত্যুর অন্তহীন তমিস্রায় সত্তার অবলুপ্তি ঘটলেও কবি মৃত্যুকে মহাজীবনের দ্বাররূপে কল্পনা করেছেন।

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীববন প্রান্তে মম
রজনীর আলো আর প্রত্যুষের শুকতারা সম।
[জন্মদিনে : সেঁজুতি

কিন্তু কবি যে একটি রহস্যময় আজনা রাজ্যের উদ্দেশ্যে এগিয়ে চলেছেন তা ভুলিবে কি করে? জীবনের উপর ব্যক্তির কর্তৃত্ব মেই, কোথায় যে তা পড়ি জামাবে কবি জানেন না। 'এ প্রাণের রাতের রেলগাড়ী / দিল পাড়ি'[৪৩] — রাতের অন্ধকারে দ্রুত ধাবমান রেলগাড়ীর উপমার মধ্যে কবির ব্যক্তিগত প্রাণের আজানা যাত্রার ইংগিত স্পষ্ট হয়েছে। বস্তু পৃথিবীতে কবি যা কিছু করেছেন তা সর্বত্র সার্থকতা লাভ না করলেও অভিজ্ঞতা সর্বাংশে সবকিছুকে অঙ্গীকৃত করেছে এবং সে হিসেবে কবিজীবন পরিণতিতে পৌঁচেছে একটি রসসমৃদ্ধ পাকা ফলের মতো, শুধু তা বৃন্ত-চ্যুতির অপেক্ষায়। তখন সব সম্পর্কের অবসান ঘটবে। একটি মাত্র উপমায় কবি জীবনের সাথে সম্পর্ক অবসানের গভীর বেদনাকে ব্যক্ত করেছেন,

পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। [পথের শেষে
ঃ জন্মদিনে

সাধারণ উপমার কি অবশ্যম্ভাবী ইংগিত। তবুও জীবনের শেষপ্রান্তে মধুময় পৃথিবীর মধুময় ধুলির শেষস্পর্শ অঙ্গে মেখে কবি মৃত্যুর গভীরে লীন হয়ে যাওয়ার ইচ্ছায় আকুল। তাঁর প্রার্থনা 'সম্মুখে শান্তি পারাবার / ভাসাও তরণী হে কর্ণধার'। তিনি বুঝেছেন এ জগত শুধুমাত্র স্বপ্ন নয়, আঘতে বেদনায় তিনি নিজেকে প্রত্যক্ষ করেছেন রক্তের অক্ষরে শুধুমাত্র সত্যের অনুধ্যানে। 'আমৃত্যুর দুঃখের এ জীবন'—কবিচিত্তে এ উপলব্ধি জীবনসত্যের প্রকৃত স্বরূপের উদ্ভাস। তাই সৃষ্টির বিপুল বৈচিত্র্যের পথে তিনি সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন 'আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে'।

পদটীকা

১। জীবন স্মৃতি, বিশ্বভারতী ১৯৬৩, সুলভ সংস্করন, পুনর্ মুদ্রন, পৃ ৭৭
২। ঐ পৃ ১০০
৩। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা — নীহারঞ্জন রায় ভূমিকা, ৫ম সং, পৃ ৩৫
৪। জীবন স্মৃতি; পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ৭৩, ৭৪, ১১২।
৫। সন্ধ্যা সংগীত — রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, অবতরনিকা।
৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড [রবীন্দ্রনাথ] ৩য় সং, ১৩৬৮, পৃ ৪০ — সুকুমার সেন।
৭। রবীন্দ্র রচনাবলী ১ম খণ্ড, কবির ভনিতা দ্রষ্টব্য।
৮। রবীন্দ্র জীবন কথা, পরিবর্ধিত সং, — প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। ১৩৬৮, পৃ ৪৩
৯। নিশীত চেতনা ছবি ও গান
১০। কবির ভূমিকা, কড়ি ও কোমল
১১। জীবন স্মৃতি, পূর্বোক্ত ১৪৪
১২। ঐ পৃ ১৪৬
১৩। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ ৫০
১৪। অপেক্ষা

১৫। নিষ্ফল উপহার

১৬। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পূর্বোক্ত, পৃ ৬৫

১৭। মানস সুন্দরী — সোনার তরী দ্রষ্টব্য

১৮। ছিন্নপত্র ১৮, বিশ্বভারতী, ১৩৬৫

১৯। মোট আটাশটি, 'রবীন্দ্র জীবনকথা', প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত পৃ ৪৯

২০। খোকা বাবুর প্রত্যাবর্তন, পোষ্ট মাষ্টার ইত্যাদি গল্প

২১। রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ (১ম খণ্ড) — প্রমথনাথ বিশী ১ল মিত্র ঘোষ সং, পৃ ১২২

২২। গ্রন্থ পরিচয় — কল্পনা দ্রষ্টব্য।

২৩। রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা, পূর্বোক্ত পৃ ৯০

২৪। দেবেন্দ্রনাথ সেন উপনিষদের মহাবানীতে ব্রহ্মচর্যের সাধনা করেছেন।

২৫। বিশ্বজগত চেতনা — মানুষ ও প্রকৃতিকে দিয়েই বিশ্বজগত

২৬। স্বদেশ চেতনা — ব্রান, প্রার্থনা ইত্যাদি নৈবেদ্যের কিছু কবিতা।

২৭। বলাকা কাব্যের শেষের দিকে আলোচনা দ্রষ্টব্য

২৮। সংখ্যায় অত্যন্ত কম। এ জাতীয় শব্দগুচ্ছের প্রাধান্য রবীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্য-গুলোতে দেখা গেছে।

২৯। শাজাহান, ছবি, চঞ্চলা ইত্যাদি কবিতা।

৩০। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ।

৩১। সাবিত্রী সত্যবান উপাখ্যান।

৩২। মহুয়া, পাঠ পরিচয় দ্রষ্টব্য।

৩৩। কাব্য ও ছন্দ। সাহিতের স্বরূপ, ২য় সং, পৃ ৩৮

৩৪। হরিপদ কেরানী কবিতাটির নায়ক।

৩৫। বাঁশি। পুনশ্চ

৩৬। ঐ

৩৭। কাব্যে গদ্য রীতি। সাহিত্যের স্বরূপ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪

৩৮। সাধারন মেয়ে। পুনশ্চ

৩৯। খোয়াই। ঐ

৪০। ঐ

৪১। ১৯৩৮ -৪১ খৃষ্টাব্দ

৪২। প্রান্তিক রচনার আগে রবীন্দ্রনাথ কঠিন অসুখে পড়েছিলেন।

৪৩। রাতের গাড়ী। নবজাতক